

ক্যুয়ো ভাদিস্

এক

"জয় চির-সম্রাজ্ঞী রোমের জয় !"

শত সহস্র সৈনিকের কণ্ঠে জেগে ওঠে জয়ধ্বনি ! সে-জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজপথ।

তিন বছর পরে···দীর্ঘ তিন বছর পরে···রোমে ফিরে আসছে বিশ্বজয়ী রোমের চতুর্দ্দশ বাহিনী।

রোম আজ বিশ্বের সম্রাজ্ঞী। একদিকে আফ্রিকা, আর একদিকে এশিয়া, মাঝখানে য়ুরোপ···রোমের বিজয়-পতাকা উড়ছে আজ এই তিন মহাদেশ ব্যেপে ! সমস্ত পৃথিবীকে রোম তার পায়ের তলায় নিয়ে আসবে, এই তার বাসনা ! এ বাসনা সফল করবার উদ্দেশ্যেই তিন বছর আগে একদিন জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে দুর্দ্ধর্ষ চতুর্দ্দশ বাহিনী বেরিয়েছিল সমস্ত য়ুরোপকে পদানত করবার জন্যে। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, নদী পেরিয়ে, দেশ-দেশান্তর ছাড়িয়ে তারা গিয়েছে দূরে বৃটেন পর্য্যন্ত রোমের বিজয়-পতাকা নিয়ে। যেখান দিয়ে যেখান দিয়ে গিয়েছে এই চতুর্দ্দশ বাহিনী, সেইখানেই উঠেছে হাহাকার, জ্বলেছে আগুন, মরেছে মানুষ, ভেঙ্গে পড়েছে সিংহাসন। অনেকেই ভয়ে ছেড়ে দিয়েছে পথ, বিনা-যুদ্ধে করেছে বশ্যতা স্বীকার ! প্রত্যেক বিজিত

দেশে তারা রোম-সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে একজন রোমানকে শাসক নিযুক্ত করে এসেছে। রোমের এই বিজয়-রথের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে রোমের সভ্যতা পৃথিবীর চারিদিকে।

দীর্ঘ তিন বছর ধরে এই বিরাট রোমান-বাহিনী জন্মভূমির মাতৃ-স্পর্শ থেকে দূরে, আত্মীয়-স্বজনের মমতা থেকে দূরে, ঘরের স্নিগ্ধ আলো থেকে দূরে ঘুরে বেড়িয়েছে···পথে-প্রান্তরে, শিবিরে-শিবিরে, হত্যা আর বিভীষিকার মধ্যে, যুদ্ধের শত অনিশ্চয়তার মধ্যে শত অসুবিধা আর শত বেদনার মধ্যে! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই প্রাণান্ত-কষ্ট তারা সহ্য করেছে শুধু রোমের গৌরবের জন্যে, লুণ্ঠনের লালসায়, যুদ্ধের উন্মাদনায়! কিন্তু তিন বছর পরে এমন একদিন এলো, যখন এই দুর্দ্ধর্ষ বিজয়-বাহিনী রণ-ক্লান্ত হয়ে পড়লো। যুদ্ধের উন্মাদনার বদলে তখন প্রত্যেক রোমান সৈনিকের রক্তে জেগে উঠলো স্বদেশের, জন্মভূমির, ঘরের পিপাসা! তারা আর এক-পা অগ্রসর হতে রাজী হলো না! তখন বাধ্য হয়েই তাদের সেনাপতি সমস্ত বাহিনী নিয়ে রোমের দিকে, জন্মভূমির দিকে ফিরলো। যতই রোমের দিকে তারা এগিয়ে আসে, ততই বুকের মধ্যে বিপুলতর হয়ে উঠতে থাকে ঘরে-ফেরার আনন্দ! তারা জানে, সমগ্র রোম জয়মাল্য নিয়ে অপেক্ষা করে আছে তাদের জন্যে! এক-একদিন যায়, তারা গুণতে থাকে, আর কত দূরে রোম? যত রোমের কাছে এগিয়ে আসে, ততই বেড়ে ওঠে তাদের অধীরতা!

ইতালীর সীমান্ত থেকে রাজধানী রোম পর্য্যন্ত রোমের দুর্দ্ধর্ষ সেনা-বাহিনীর জন্যেই তারা তৈরী করেছে বিস্ময়কর এক রাজপথ—

এপিয়ান ওয়ে। এপিয়ান রাজপথে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দু'ধার থেকে আনন্দমত্ত জনতা উন্মাদের মত জয়ধ্বনি করে ওঠে। পুর-নারীরা বেরিয়ে এসে জয়মাল্য বর্ষণ করে। সৈনিকদের বাহুর উপর গড়ে উঠেছে বিরাট রোমান-সাম্রাজ্যের জয়-স্তম্ভ···তাই সেদিন রোমের নর-নারী রোমান সৈনিককে পূজা করে দেবতার মতন!

সারা এপিয়ান রাজপথ এই ভাবে জয়মাল্য কুড়োতে কুড়োতে অজেয় চতুর্দ্দশ বাহিনী রোমের সীমান্তে এসে পৌঁছোয়।

সামনের ঐ পাহাড়, ওটা পেরিয়ে গেলেই রোম! বিরাট বাহিনীর অবিরাম গতিতে ধুলো উড়ছে ঘুরপাক খেতে খেতে! সৈনিকদের লোহার বর্ম্ম আর শিরস্ত্রাণ ধূসর হয়ে উঠেছে সে ধুলোয়! কিন্তু তাদের ঢালের উপর খোদাই-করা রোমান শক্তির প্রতীক-চিহ্ন ···ব্রোঞ্জের ঈগল···সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করছে ক্ষুদে ক্ষুদে সূর্য্যের মত! আগে চলেছে অসংখ্য যুদ্ধ-রথ, তারপর অশ্বারোহী সেনা, তার-পর সেই দুর্জ্জয় পদাতিক সেনা, যাদের ব্যূহ কোন শত্রু কোনদিন ভেদ করতে পারেনি!

পদাতিক সেনার পরে আছে ক্রীতদাস-বাহিনী, মালবোঝাই গাড়ীর সঙ্গে লোহার শিকলে তাদের জুতে দেওয়া হয়েছে বলদের বা ঘোড়ার মত। পরাজিত দেশের সৈনিকদের তারা ক্রীতদাস করে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ধুলোর ভিতর গভীর ভাবে বসে যাচ্ছে গাড়ীর চাকা, আর ক্রীতদাসেরা প্রাণপণে টানছে গাড়ী—চালকের চাবুকের ভয়ে! ঘাড়ের আর বুকের পেশী ফুলে ফুলে উঠছে লোহার দড়ার মত, ঘাম বইছে বৃষ্টি-ধারার মত, আর আগুন-সাপের ছোবলের মত

চাবুক পড়ছে হিস্-হিস্ শব্দে। এই দাসেরা কোন কালে দাস ছিল না—যুদ্ধে বন্দী হয়ে এই দশায় পড়েছে আজ। তাদের মধ্যে অনেকে একদিন রণদক্ষ যোদ্ধা ছিল, সেনানায়ক ছিল; পরাজিত রাজবংশের দু-চারজন লোকও আছে তাদের মধ্যে। আজ তারা শৃঙ্খলিত, তাদের দেশও শৃঙ্খলিত!

হাল্কা রথের উপর বসে ঘাড় ঘুরিয়ে মার্কাস ভিনিসিয়াস লক্ষ্য করছেন পিছন দিকে। এই বিজয়-বাহিনীর সেনাপতি তিনি। দিগন্ত পর্য্যন্ত লম্বিত ঐ দীর্ঘ সৈন্যশ্রেণী এঁকে বেঁকে অজগরের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এপিয়ান ওয়ে ধরে—ওরা মার্কাসের আজ্ঞাবহ। ওদের দেশে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন বিজয়-গৌরবে, তার জন্যে মার্কাস মনে মনে গর্ব্বিত। কিন্তু শত সহস্র বীর রোমান যোদ্ধা যে তাঁরই আদেশ পালন করতে গল আর বৃটেনের অরণ্যে পর্ব্বতে নদীসৈকতে অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে, তাদের চিন্তা মার্কাসের মনে এতটুকু ছায়াপাত করেনি আজকের এই আনন্দ-কলরবের মুহূর্ত্তে! সৈনিকরা মরবার জন্যেই যুদ্ধে যায়, তাতে দুঃখ করবার কি আছে? আর হাজারে হাজারে লাখে লাখে সৈনিক যদি এই ভাবে আত্মদান না করতো, তাহলে কি রোমান সাম্রাজ্যের এই মহা-গৌরব গড়ে উঠতে পারতো?

মার্কাস ঘাড় ফিরিয়ে দূর-বিসর্পী সৈন্যশ্রেণী নিরীক্ষণ করলেন। তারপর তাঁর চোখ পড়লো ঠিক তাঁর পিছনের রথের উপর। সে-রথে আছেন তাঁর সহকারী, ট্রিবিউন ফেবিয়াস। দু'জনেই তরুণ, পদ-মর্য্যাদায় তারতম্য থাকলেও দু'জনের মধ্যে নিবিড় সখ্য আপনা

থেকে গড়ে উঠেছে। মার্কাস হেসে বললেন—এসো ফেবিয়াস, রথের দৌড়ে কে জেতে, দেখা যাক! ঐ পাহাড়ের চূড়া পর্য্যন্ত দৌড়ুনো যাক, এসো!

দু'খানা রথ পাশাপাশি ছুটলো—বাহিনী ছেড়ে অনেকদূর এগিয়ে গেল তারা। পাহাড়ের চূড়ায় যখন পৌঁছুলো, তখনও কেউ কাউকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি! মার্কাস আর ফেবিয়াস একসঙ্গেই রথ থামালেন। কারণ তাঁদের দৌড়ের সীমা এসে গিয়েছে, তাছাড়া পাহাড়ের ও-পিঠ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে উপরে উঠে আসছে একদল অশ্বারোহী। এক তরুণ সৈনিক তাদের পুরোভাগে।

মার্কাসকে দেখে সে অভিবাদন করলো—স্বাগত, সেনাপতি মার্কাস ভিনিসিয়াস···রোমের স্বাগত সম্ভাষণ জানাই আপনাকে। মহামান্য সম্রাট্ নীরোর তরফ থেকে আপনাকে স্বাগত জানাই আমি।

মার্কাস উল্লসিত মনে সে অভিবাদন গ্রহণ করে বললেন,—আপনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন বুঝি? তাহলে শীগ্গির করুন। আমার সৈনিকরা ঘরে ফেরবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে!

সৈনিক বিনম্রভাবে উত্তর দিলেন—এ-সম্বন্ধে সম্রাটের এক আদেশ এনেছি আমি। এই বলে তিনি একখানি কাগজ দিলেন মার্কাসের হাতে। তাতে সম্রাটের শীল-মোহর।

মার্কাস দ্রুত-হস্তে খুলে ফেললেন সম্রাটের আদেশ-লিপি। চোখের পলকে আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করলেন, ফেবিয়াসের হাতে সেটা দিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন—চমৎকার স্বাগত সম্ভাষণ! সম্রাটের আদেশ

যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ এই পথের উপর অপেক্ষা করে থাকতে হবে আমাদের !

ধীর বিদ্রূপের স্বরে পিছন থেকে কে-একজন সৈনিক চেঁচিয়ে উঠলো—রোম দেখছি সত্যই ভালোবাসে তার সৈনিকদের !

মার্কাসের চোখে আগুন জ্বলে উঠলো ! অধীন একজন সেনা-নায়ককে ডেকে তিনি বললেন—এখনি লোকটাকে চল্লিশ কোড়া লাগাও ! আবার যদি ওর মুখ থেকে এমন কথা বেরোয়, চল্লিশের জায়গায় তখন আশী কোড়া !

তিন বছরের অসাধ্য-সাধনের পর রোমের সম্রাটের কাছ থেকে এ আদেশ পেয়ে মার্কাস বলে উঠলেন—এই দণ্ডে জানতে চাই, এ অদ্ভুত আদেশের অর্থ কি !

ঘোড়ার লাগাম তুলে তিনি একটা ঝাঁকুনি দিলেন। ঘোড়াগুলো লাফিয়ে সামনে অগ্রসর হলো। মার্কাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—পথ ছেড়ে দাঁড়াও গার্ডরা।

ফেবিয়াস চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় যান সেনাপতি ?

ছুটন্ত রথের উপর থেকে উত্তর এলো—নীরোর প্রাসাদে।

গার্ডদের মাঝখান দিয়ে পথ। মার্কাস পাহাড় থেকে নামতে লাগলেন ঝড়ের বেগে। পথের পাশে জমিতে কাজ করছিল যে-সব ক্রীতদাস, তারা ঘাড় তুলে তাকিয়ে দেখে, উল্কার বেগে একখানা রথ চলেছে ছুটে ! পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কটা মোরগ আর শূকর—চাকায় চাপা পড়বার ভয়ে এদিকে ওদিকে যেদিকে পারলো, তারা ছুটে পালাতে লাগলো।

রোমের সিংহ-দ্বারের ভিতর দিয়ে পাথরে-ছাওয়া সরু পথ। এ পথ চলে গিয়েছে সোজা প্রাসাদের দিকে। এই পথে ঝড়ের বেগে ছুটে চলে মার্কাসের রথ। পথচারীরা প্রাণের ভয়ে পাশের বাড়ীর দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়! রথের চাকা কারো কারো গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল···সেদিকে মার্কাসের ভ্রূক্ষেপ নেই! সেদিন মানুষের জীবনের মূল্য তাঁর কাছে কিছু না!

রোম তখন পৃথিবী শাসন করছে। বিজিত জাতির শত-শত লোক ক্রীতদাসের জীবন বহন করছে রোমে এসে। তাদের জীবনের কী মূল্য? মার্কাসের বা অন্য কোনো অভিজাত রোমানের রথের নীচে চাপা পড়ে তাদের দু'-একজন যদি মরে—রাজার তাতে কি আসে যায়? ওরা তো রাজার সেবায় জীবন সমর্পণ করে বসে আছে! আজ মরুক আর কাল মরুক, সমান কথা!

কিন্তু মার্কাস আসলে নিষ্ঠুর নন—নিজের বা রোমের যদি প্রয়োজন হয়, সকল অবস্থাতেই দু'-দশজন বা দু'-দশ হাজার লোকের জীবন বলি দিতে পারেন! কিন্তু বিনা-প্রয়োজনে দুর্ঘটনায় কেউ মরে, এ তিনি চান না!

কিন্তু সেদিন মার্কাসের খেয়াল ছিল না, কে তাঁর রথের চাকায় পিষে মরছে! তাঁর সৈনিক-মন রাগে দিশাহারা হয়ে উঠেছে! সম্রাটের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়োজন এখনি—অবিলম্বে! সামান্য নাগরিকদের কথা চিন্তা করবার অবসর এখন তাঁর নেই! প্রাসাদের দ্বার ঐ দেখা যায়! একজন পথচারীর হাতে ঘোড়ার লাগাম ছুড়ে দিয়ে লাফিয়ে তিনি নামলেন রথ থেকে।

তোরণ-পথে প্রবেশ না করে তিনি একটা গাড়ী-বারান্দার দিকে গেলেন। গাড়ী-বারান্দার তলায় একটা সংকীর্ণ দ্বার। সে-দ্বার দিয়ে এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা যায়। প্রাঙ্গণের চারিদিকে মর্ম্মরের স্তম্ভ। হলদে পাথরের উপর এসে পড়েছে প্রভাতের খর-রৌদ্র। স্তম্ভগুলির রং বদলাচ্ছে প্রতিক্ষণে—কখনো হচ্ছে সোনালী, কখনো গোলাপী!

স্তম্ভগুলির মাঝে মাঝে দেবতাদের বড় বড় মূর্ত্তি! শুধু দেবতাদের মূর্ত্তি নয়, রোমের প্রাচীন বীরদের মূর্ত্তিও! এই সব মূর্ত্তির আশেপাশে অসংখ্য পুরুষ আর নারী। মূর্ত্তি আর মানুষ—সকলের এক রকম পোষাক—সেই একই চোগা, একই বহির্ব্বাস, ভাঁজে-ভাঁজে এলিয়ে পড়েছে—ঊর্দ্ধাঙ্গ থেকে পায়ের উপর। এ পোষাকে প্রচুর মর্য্যাদা, আবরণের যত অভাবই থাকুক!

কি করেই বা মর্য্যাদা থাকে? আগের যুগে প্রাসাদে যাদের অবাধ গতি ছিল, তারা শ্রেষ্ঠ অভিজাত-বংশের লোক। কিন্তু এখন? সে সব বাধা-নিষেধ সম্রাট তাঁর আমলে শিথিল করেছেন। তাঁর ভোজের টেবিলে নানা জাতির লোক বসে, নানা প্রকৃতির লোক। উচ্চ অভিজাত আছেন, আবার এমন লোকও আছে—যারা ভদ্র-সমাজে মেশবার অধিকার থেকে বঞ্চিত। যে অভিজাত শ্রেণীর লোকদের কাজ করবার শক্তি নেই, বুদ্ধি নেই, যারা শুধু স্তাবকতা করে অর্থ বা মর্য্যাদা চায়—তারাই আসে সম্রাটের এ ভোজের আসরে।

শুধু পুরুষ নয়, নারীও আছে এ দলে। পুরুষদের চেয়েও তারা নির্লজ্জ···বিবেককে তারা ঘুম পাড়িয়ে অচেতন করে ফেলেছে—

ধর্ম্মের কোন ধার ধারে না! রোমের অগাধ ঐশ্বর্য্যের মত্ততার মধ্যে এই সব নারী হারিয়ে ফেলেছে নারী-সুলভ লজ্জা-সম্ভ্রম, চরিত্রের শুভ্রতা! এই বিলাসের রাজধানীতে নর্ত্তকীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা প্রতিযোগিতায় নেমেছে যেন! তাদের একমাত্র লক্ষ্য, রূপের বিনিময়ে ঐশ্বর্য্য আহরণ!

ঐশ্বর্য্যের মুষ্টি-ভিক্ষার লোভে প্রাসাদের প্রাঙ্গণে সব সময়ে ঘুরে বেড়ায় নানা ধরণের বিচিত্র লোক। কোথাও মল্লবীররা—গ্লাডিয়েটর নামে পরিচিত—তারা নানা কসরৎ দেখাচ্ছে; কোথাও বাজিকররা বাজনা বাজিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে; সে-ভিড়ে কবিরাও আছেন, ভিড় দেখলেই তাঁরা কবিতা আবৃত্তি করছেন। কোথাও এক ধারে আবার একজন দার্শনিক দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে যেন পাগলের মেলা!

এ সবের দিকে দৃক্‌পাত না করে মর্ম্মর সোপান বেয়ে উপরে উঠে মার্কাস ঢুকলেন প্রশস্ত হল-ঘরে। সেখানেও অসম্ভব মানুষের ভিড়। সকলেই সম্ভ্রান্ত; কিন্তু সম্রাটের খাশ কামরায় প্রবেশের অধিকারী নন্। এ হল-ঘর পার হয়ে সুদীর্ঘ দালান, তার শেষ প্রান্তে দু'জন সামরিক অফিসার পাহারা দিচ্ছে। মার্কাস সোজা এসে তাদের সামনে দাঁড়ালেন। তারা আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠলো। মার্কাস বললেন—আমি সেনাপতি মার্কাস ভিনিসিয়াস—সম্রাটের দর্শন-প্রার্থী। যত শীঘ্র সম্ভব···

—এখনি খবর দিচ্ছি। একজন অফিসার লাল রেশমী পর্দা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

ভিতরে বিশাল কক্ষ। তার প্রাচীরে, গৃহতলে, ছাদে গ্রীক্ শিল্পের নানা অপরূপ সৃষ্টি জ্বল্‌জ্বল্ করছে! মর্ম্মর, স্ফটিক, সোনার ছড়াছড়ি চারিদিকে। প্রত্যেকটি দরজা-জানলার সামনে লাল রেশমী পর্দ্দা ঝুলছে। আলো আসছে গন্ধ-তৈলে জ্বালা অগণ্য প্রদীপ থেকে। উচ্চ স্বর্ণাসনে বসে আছেন সম্রাট—পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে এক অনিন্দ্যসুন্দরী ক্রীতদাসী। আর এক সুন্দরী সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর পায়ের নখ পরিষ্কার করছে। দু'পাশে আরও দুই রূপসী—একজনের হাতে নানা সুস্বাদু ফলে পূর্ণ স্বর্ণথালি; অপরের হাতে পানীয়পূর্ণ স্বর্ণভৃঙ্গার।

নীরোর মুখের গড়ন দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়! মাথার উপর দিকটা দেখলে শ্রদ্ধা হয়। উন্নত ললাট—চোখে ঈগল পাখীর মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—ঈগলেরই মত বঙ্কিম নাসিকা। যেন মর্ম্মরে খোদাই-করা জুপিটারের মুখ!

কিন্তু মুখের নীচের দিকে চেয়ে দেখলে মনে আতঙ্ক হয়! স্ফীত চিবুক যেন বিলাসের লীলা-ক্ষেত্র! পুরু ঠোঁটে ভীষণ নৃশংসতা! বানর আর বাঘ, এই দুটো জানোয়ারের বৈশিষ্ট্য মুখের রেখায় রেখায় ফুটে রয়েছে!

সামরিক কর্ম্মচারী সম্রাটের কক্ষে প্রবেশ করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে অভিবাদনের ভঙ্গীতে। কথা বলে প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার অধিকার তার নেই। এই ভাবে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে হবে—যতক্ষণ না নিজে থেকে সম্রাটের দৃষ্টি পড়ে তার উপর! সে দৃষ্টি সহজে বা শীঘ্র পড়বে, এমন সম্ভাবনা নেই। তার কারণ, সম্রাটের বাঁ

দিকে বসে বীণা বাজাচ্ছেন তার্প্‌নস্—স্বর্ণাসনের মণিমণ্ডিত হাতলে সম্রাট তাল ঠুকছেন তন্ময় হয়ে।

তার্প্‌নসের পিছনে নীরোর ঠিক কাণের কাছে দাঁড়িয়ে পেত্রোনিয়াস—সুপুরুষ···দীর্ঘদেহ। তাঁর কমনীয় কান্তি দেখে কেউ বুঝবে না, বেশভূষা আর প্রসাধনে-ভূষিত ঐ দেহের পেশীর শক্তি প্রায় ইস্পাতের দণ্ডের মত! ইনি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, কৌশলী। পারিষদ-বৃত্তি অবলম্বন না করে তিনি যদি রাজনীতিতে মন দিতেন, তাহলে রাষ্ট্রনেতা হতে পারতেন! কিন্তু সে খ্যাতির মোহে রাজনীতির জটিল আবর্ত্তে ঝাঁপ না দিয়ে নীরোর ব্যক্তিগত জীবনে আরাম-বিরাম যোগাতেই তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। তবে চাটুবৃত্তির মধ্যে থেকেও তাঁর ব্যক্তিত্ব সব সময়ে সাড়া দেয়। যে-কৌশলে পেত্রোনিয়াস নিজের প্রভাব বিস্তার করেছেন সম্রাটের উপরে, সে কৌশল খেলাবার মত বুদ্ধি আর সাহস সম্রাটের আসরে আর কারো নেই!

মার্কাস ভিনিসিয়াসের মামা এই পেত্রোনিয়াস।

পেত্রোনিয়াসের অনেক শত্রু। সম্রাটের দরবারে যারা মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাদের উপর বিষ-নজর পড়ে অন্য পারিষদদের। নীরোর অন্তরঙ্গদের মধ্যে আছেন তাইজেলিনাস—তাঁর প্রতিপত্তিও বড় অল্প নয়। সম্রাটের দেহ-রক্ষী যে প্রিটোরিয়ান গার্ড দল, তাদের অধ্যক্ষ এই তাইজেলিনাস!

পেত্রোনিয়াসের মর্ম্মান্তিক শত্রু তাইজেলিনাস!

* * * *

তার্প্‌নসের বীণা বেজে চলেছে—স্বর্ণাসনের হাতলে নীরোর তাল ঠোকারও বিরাম নেই, বিচ্ছেদ নেই!

হঠাৎ সম্রাট চোখ তুলে সামনের দিকে তাকালেন। সামরিক অফিসারের উপর নজর পড়লো। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—কী ব্যাপার?

—সেনাপতি মার্কাস ভিনিসিয়াস দর্শন-প্রার্থী।

—মার্কাস ভিনিসিয়াস!—সে আবার কে?

তাইজেলিনাসের কর্ত্তব্য, সম্রাটের এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। সমর-বিভাগের তথ্য প্রিটোরিয়ান গার্ডের অধ্যক্ষের কাছ থেকেই জানবার কথা! উত্তর তিনি হয়তো দিতেন, কিন্তু পেত্রোনিয়াস সে-সুযোগ তাঁকে দিলেন না—তাইজেলিনাসের মুখ থেকে মার্কাস সম্বন্ধে ভালো কথা বেরুবে না—তিনি তা বিলক্ষণ জানেন।

পেত্রোনিয়াস বললেন—প্রভু, মার্কাস আমার ভাগনে। গল আর ব্রিটেনে ও ছিল সম্রাটের সেনাপতি। দিগ্বিজয় শেষ করে প্রভুর চরণ দর্শন করতে এসেছে।

তাইজেলিনাস প্রতিবাদ করে উঠলেন—সম্রাটের আদেশ অমান্য করেছেন এই মার্কাস ভিনিসিয়াস! পুনরাদেশ না পেলে রোমে ঢুকতে তাঁকে নিষেধ করা হয়েছিল! এবং সে-আদেশ আপনি নিজে দিয়েছিলেন, সম্রাট!

ভ্রূকুঞ্চিত করে নীরো বলে উঠলেন—ঠিক! ঠিক! আমার মনে পড়ছে বৈ কি! তোমার ভাগনের এমন ধারণা হলো কেন পেত্রো-নিয়াস, যে, গোটা-কতক যুদ্ধ জিতে সম্রাটের আদেশ অমান্য করবার অধিকার হয়েছে তার!

ক্যুয়ো ভাদিস্—



রথের উপর···বিজয়-বাহিনীর সেনাপতি মার্কাস ভিনিসিয়াস

[ছবি—মেট্রো গোল্ডউইনের সৌজন্যে

চতুর পেত্রোনিয়াস বিনীত হাস্যে উত্তর দিলেন—তা কখনো হতে পারে না! সৈন্যদল নিয়ে মার্কাস কখনো রোমে প্রবেশ করতে পারে না এ সময়! আমার মনে হয়, নগরের দ্বারে এসে সম্রাটের চরণ দর্শন করবার জন্য সে এত ব্যাকুল যে সৈন্যদের রেখে সে একা এসেছে প্রভুকে অন্তরের ভক্তি নিবেদন করবার জন্য। দীর্ঘ তিন বছর সীজারের কাছ থেকে দূরে থাকা রাজভক্ত রোমানদের পক্ষে কতখানি মর্ম্মান্তিক, তা অপরে না জানলেও সীজার তা বোঝেন, নিশ্চয়! কারণ, জগতে প্রভুর অজানা কি আছে? আপনি দেবতা!

তোষামোদের এমন মহিমা, মার্কাসের উপর বিরক্ত না হয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠলেন নীরো। যে-কাজের জন্য তিরস্কার প্রাপ্য ছিল, তার দরুণ পুরস্কৃত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলো। তাইজেলিনাস মুখ বিকৃত করলেন, সামরিক অফিসারকে ইঙ্গিত করলেন দর্শন-প্রার্থীকে নিয়ে আসবার জন্য। অফিসার মার্কাসকে সম্রাটের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল।

বাহু উত্তোলন করে মার্কাস অভিবাদন জানালেন—জয় হোক সম্রাটের!

ধীরে জড়িত স্বরে নীরো উত্তর দিলেন—কল্যাণ হোক, সেনাপতি! সামনে এসো। তোমার এই মামা এতক্ষণ আমাকে বোঝাচ্ছিলেন, আমায় দেখবার জন্য উন্মাদের মত ছুটে এসেছো তুমি। সেনাপতিদের মনে এমন রাজভক্তি সঞ্চার করতে পেরেছি জেনে আমার আনন্দের সীমা নেই!

সম্রাটের কথার উত্তর দেবার আগে পেত্রোনিয়াসের সঙ্গে নীরবে

দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেল মার্কাসের। সম্রাটকে আবার অভিবাদন জানিয়ে মার্কাস বললেন—আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা, আমার দেহ-মন, আমার জীবন—সীজারের! আমার সৈনিকরা দীর্ঘদিন বাইরে কাটিয়েছে। সম্রাটের জন্য তারা যুদ্ধ করেছে, সম্রাটের জন্যে তাদের অনেকে প্রাণ দিয়েছে। সীজারের জয়-পতাকা দেশ-দেশান্তরে উড়িয়ে আজ তারা বাড়ী ফিরছে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তারা অধীর আগ্রহে ক্লান্তপদে রোমের দিকে হেঁটে আসছে। ঘরে প্রিয়জনের মুখ দেখবার জন্যে—স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গ পাবার জন্যে তারা অত্যন্ত অধীর আকুল, সম্রাট।

মার্কাসের কথার শেষার্দ্ধ বোধ হয় নীরোর কানে গেল না। সৈনিকরা সম্রাটের জন্যে দলে দলে প্রাণ দিয়েছে, এইটুকু শুনে তাঁর দুচোখ জলে ভরে এলো। কম্পিত স্বরে তিনি বললেন—তুমি ঠিক বলেছো পেত্রোনিয়াস! আশ্চর্য্য এদের রাজভক্তি!

মার্কাস কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নন! তিনি আবার বললেন—তাই আমার নিবেদন—সীজার যদি সৈনিকদের এখনো তাদের স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ না দেন, তারা ভাববে, সীজার আমাদের দুঃখ বুঝলেন না।

নীরো বিরক্ত ভাবে তাইজেলিনাসের দিকে তাকালেন, বললেন—হুকুম-নামায় তুমি সব কথা খুলে লেখোনি?

মৃদু হেসে পেত্রোনিয়াস বললেন—বন্ধু তাইজেলিনাস হয়তো এ আদেশ দেবার কারণ উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন!

পেত্রোনিয়াসের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাইজেলিনাস

বললেন—সম্রাটের আদেশ—আদেশই ! হুকুম-নামায় কারণ দেখাবার হেতু থাকতে পারে না।

এ কথার জবাব দিলেন নীরো। তিনি বললেন—তা হয় না বটে ! কিন্তু ভেবে দেখ, তার ফলে ব্যাপারটা বর্ব্বরোচিত হয়ে গেছে ! তিন বছর পরে যুদ্ধ জয় করে সৈন্যরা সম্রাটের কাছে ফিরে আসছে, নগরের দ্বার রুখে তাদের আটকে রাখা হলো কোন কারণ না জানিয়েই ! তারা ভাববে না, আমরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ ?

তারপর নীরো মার্কাসের দিকে তাকিয়ে বললেন—শুধু একটা দিন অপেক্ষা করো, সেনাপতি ! আফ্রিকা আর এশিয়া থেকেও দুটি বাহিনী আসছে। তারা এলে সকলে একসঙ্গে এ বিজয়োৎসবে মিছিল করে রাজধানীতে প্রবেশ করবে ! নাগরিকরা সম্মান দেখাতে চায় তাদের সাহসী সৈনিক আর সেনাপতিদের। এ রকম উৎসব মাঝে মাঝে হওয়া দরকার। তাতে নাগরিকরা আনন্দ পায় ! জাঁকজমক হৈ-চৈ তাদের ভালো লাগে !

মার্কাস আবার অভিবাদন করলেন। সীজারের অভিপ্রায় বুঝেছেন। অনধিকার প্রবেশ করে যে অন্যায় করেছেন, তার জন্য তিনি মার্জ্জনা চাইলেন।

মার্কাস বেরিয়ে এলেন সম্রাটের কক্ষ থেকে। সম্রাটের অনুমতি নিয়ে পেত্রোনিয়াসও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন—মার্কাসকে একটা খবর দেবার জন্য।

—শোনো মার্কাস ! তোমার বাহিনী এখন যেখানে রয়েছে, কাছেই সেনাপতি প্লতিয়াসের বাড়ী। আজ রাত্রিটা তুমি সেখানে থাকো। আমি প্লতিয়াসকে খবর দিয়ে তার ব্যবস্থা করে রেখেছি।

দুই

এপিয়ান ওয়েয় পাশেই মার্কাসের বাহিনী ছাউনি ফেলে রইলো। সম্রাট আশ্বাস দিয়েছিলেন, শুধু একটা দিন! তার পরই এশিয়া আর আফ্রিকার সৈন্যরা এসে পড়বে। কিন্তু তাদের আসতে বিলম্ব হতে লাগলো। কাজেই পেত্রোনিয়াসের কথামত মার্কাস স্থির করলেন—সেনাপতি প্লতিয়াসের গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ করবেন।

ট্রিবিউন ফেবিয়াসকে নিয়ে মার্কাস যখন প্লতিয়াসের ভিলাতে উপস্থিত হলেন, তাঁদের অভ্যর্থনা জানালো দুটি ভৃত্য। তার পর তারস্বরে স্বাগত সম্ভাষণ শোনা গেল যার মুখ থেকে, সে একটি তোতাপাখী! পুরোহিতের মত গম্ভীর কণ্ঠে সে বলে উঠলো—মঙ্গল হোক!

বাইরে থেকে ভিলাটি চমৎকারই মনে হয়। কিন্তু ভিতরের উঠানে প্রবেশ করতেই অতিথিদের মনে হলো, তাঁরা যেন এক স্বপ্নরাজ্যে এসেছেন! মাঝখানে ছোট একটি জলাশয়, তার ঠিক উপরে খোলা ছাদের ভিতর দিয়ে খর-রৌদ্র এসে উজ্জ্বল করে তুলেছে অগভীর জলের তলা পর্য্যন্ত। সেই জলাশয়ের চারিধারে ফুল আর ফুল! অজস্র ফুল! আনিমোন আর লিলি! লিলি ফুলেরই রাজত্ব যেন বাড়ীতে! লিলির ঝাড়—সাদা লিলি, লাল লিলি! জলের ধারে ধারে ভিজে শ্যাওলা, তার মধ্যে লিলির টব। ব্রোঞ্জের ছোট ছোট মূর্ত্তি উঁকি দিচ্ছে লিলির পাতার ফাঁকে-ফাঁকে। কোনোটি শিশুর মূর্ত্তি,

কোনোটি বা জলচর পাখীর! এক কোণে একটি হরিণ-শাবকের মূর্ত্তি —সে যেন তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে জল পানের জন্য মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে শঙ্কিত ভাবে চারিদিকে চাইতে-চাইতে!

উঠানের মেঝে মোজেক-মণ্ডিত। চারিদিকের দেওয়াল—কতক লাল পাথরের তৈরী, কতক বা কাঠের। সেই কাঠের দেওয়ালে চিত্রিত মাছ, পাখী, নানা আজগুবি আকারের কত অচেনা জীব।

গভীর শান্তির পরিবেশে বাড়ী আচ্ছন্ন। এ যেন নীরোর যুগের রোম নয়—হিংসার রক্তপাত থেকে চিরমুক্ত নিরালা তপোবন যেন! কিন্তু মার্কাস আর ফেবিয়াসের ভালো লাগলো না এই নীরব প্রশান্তি। দীর্ঘ তিন বৎসর সাম্রাজ্যের সুদূরতম প্রদেশে তাঁরা প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাটিয়ে এসেছেন, এ নিদ্-মহলে তাঁদের মন হাঁফিয়ে ওঠে!

ফেবিয়াসের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে কী যেন বিরূপ মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন মার্কাস, এমন সময় ভিতর-মহল থেকে প্লতিয়াস বেরিয়ে এলেন—সঙ্গে তাঁর পত্নী পম্পেনিয়া।

পরিণত বয়স,—সৌম্য, শান্ত, অতি সম্ভ্রান্ত চেহারা প্লতিয়াসের। রোম সাম্রাজ্যের অবসর-প্রাপ্ত সেনাপতি। ভিনিসিয়াস এখন যে-অঞ্চলে যশ-গৌরব লাভ করে এসেছেন, সেই গল আর ব্রিটেনে তিনি দীর্ঘদিন যুদ্ধ করেছেন। এখন অবসর নিয়ে নিভৃতবাস করছেন। রোমের সম্ভ্রান্ত সমাজের উৎসবে ক্বচিৎ কখনো দেখা যায় তাঁকে। রাজধানীর উত্তেজনা হট্টগোলের চেয়ে গৃহের শান্তি আজ তাঁর ভালো লাগে। রাজসভার পঙ্কিল আবহাওয়ার চেয়ে পম্পেনিয়ার স্নিগ্ধ-সঙ্গ তাঁর অনেক বেশী কাম্য।

তিনি এসে সেকেলে সৌজন্য-ভরে বললেন—আপনাকে অন্তর থেকে সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছি, মার্কাস ভিনিসিয়াস!

বয়সে যাঁরা বড়, তাঁদের সম্মান-প্রদর্শনে মার্কাসের কোনদিন কার্পণ্য নেই, বিশেষ তাঁরা যদি সামরিক মর্য্যাদায় মার্কাসের চেয়ে বড় হন! তাই তিনি উত্তর দিলেন—আমিও আপনাকে অভিবাদন করি, সেনাপতি! গল আর ব্রিটেনে যে সব চমৎকার পথে আমরা যাতায়াত করবার সুযোগ পেয়েছি, সে-সব আপনি তৈরী করিয়েছেন, আমরা জানি। ইনি আমার বন্ধু ট্রিবিউন ফেবিয়াস।

ফেবিয়াস নমস্কার করলেন প্লতিয়াসকে। পম্পেনিয়ার কাছে তরুণ সেনানীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। তিনি অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে স্বামীকে বললেন—এঁদের এখন সব আগে দরকার স্নান করে পোষাক বদল করা। স্নানের ঘরে সব ব্যবস্থা ঠিক করা আছে। তুমি এঁদের পথ দেখিয়ে দাও।

স্নানাগারের ভৃত্যদের কাছে অতিথিদের পৌঁছে দিয়ে প্লতিয়াস তখনকার মত বিদায় নিলেন।

প্রকাণ্ড টব্। গরম জল নিয়ে একজন লোক এলো স্নানাগারে। লোকটিকে দেখতে দৈত্যের মত। সাধারণ মানুষ একটা কুঁজো নিয়ে আসে যেমন স্বচ্ছন্দে—বিরাট টব নিয়ে এ লোকটি তেমনি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছে। ফেবিয়াসের সামনে জলের পাত্র রেখে সে বললো—আপনি এতে স্নান করুন।

তার চোখে শিশুর মত সরল দৃষ্টি। তাতে সংশয় বা সংকোচ নেই।

সে-যুগের রোমানদের মল্লক্রীড়ায় অত্যন্ত অনুরাগ ছিল; সেজন্য মল্লদের পছন্দ করতো খুব বেশী। মার্কাস এ লোকটির বিশাল বক্ষ আর যুগল বাহুর স্ফীত পেশীর দিকে উৎফুল্ল দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি?

উত্তর হলো—আর্শাস্।

—এখানে খেলাধুলোর কি খবর? ক্রোটন এখনও সকলের সেরা?

—তা আমি জানি না!

উত্তর শুনে মার্কাস স্তম্ভিত!—জানো না, মানে? তুমি বলতে চাও, সেনাপতি প্লতিয়াস তোমাকে মল্লবিদ্যা শেখাবার জন্য বলেননি কখনো? সে-কাজে বস্তা বস্তা মোহর এনে দিতে পারতে যে তাঁকে!

—আমি লড়াই করি না।

—তুমি লড়াই করো না। আরে, তোমার একখানা হাত বেঁধে রাখলেও বলবো, তুমি ঘণ্টায় পঞ্চাশটা নিগ্রোকে সাফ্ করতে পারো! তোমার মনিবকে আমি এ কথা বলবো। তোমাকে যে রোমের সেরা মল্ল করে তোলা যায়!

আর্শাস্ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলে—কিন্তু মানুষ মারা পাপ।

আর্শাস্ ধীরে ধীরে স্নানাগার থেকে বেরিয়ে গেল। মার্কাস বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ফেবিয়াসের দিকে ফিরে বললেন—লোকটার মাথা খারাপ, নিশ্চয়। মনে হচ্ছে, বাড়ীটাতে কেমন উল্টো হাওয়া বইছে যেন! সারা রোম গম্‌গম্ করছে, অথচ এখানে সব নিঝুম নিস্তব্ধ!

স্নান শেষ করে বিরক্তভাবেই মার্কাস সেই বাগানের দিকে চললেন। কিন্তু কাছাকাছি আসতে তাঁর সব বিরক্তি যেন যাদুমন্ত্রে উবে গেল! অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়লো! এক অনিন্দ্য সুন্দরী কিশোরী লিলির বাগানে ঘুরে ঘুরে ফুল তুলছে। বাইরে আর পাঁচজন সৈনিকের মত কঠিন রুক্ষ হলেও মার্কাস মনে মনে সৌন্দর্য্যের পূজারী। তাই সেই অপরূপ সুন্দরী কিশোরীকে দেখে তাঁর অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠলো। কথা না কয়ে তিনি থাকতে পারলেন না।

—তোমার নাম?

—লিজিয়া।

—আমি তোমাকে কিনবো!

—কিনবেন! কিন্তু আমি ক্রীতদাসী নই। সেনাপতি প্লতিয়াসের মেয়ে আমি!

লজ্জায় মার্কাস এক-পা পিছিয়ে এলেন।—আমায় ক্ষমা করুন। তিন বছর মাঠে আর জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে!

কোনো কথা না বলে যেমন ফুল তুলছিল, মেয়েটি তেমনি ফুল তুলতে লাগলো।

* * *

আহারের সময় প্লতিয়াস গল-ব্রিটেনের যুদ্ধের কথা পাড়লেন। এককালে রোমান সৈন্যের তিনি অধিনায়ক ছিলেন ও-অঞ্চলে। কাজেই মার্কাসের কৃতিত্বের পরিচয় নেবার জন্য কৌতূহল হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। নিজের বাহাদুরির কথা নিজের মুখে বলতে

মার্কাসের আপত্তি ছিল না। ফেবিয়াসকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—লণ্ডনিয়ামে সেবার আমরা কি বিপদে পড়েছিলাম, মনে আছে তোমার ?

—মনে নেই আবার ?—বললেন ফেবিয়াস।

প্লতিয়াসের দিকে ফিরে মার্কাস বললেন—কি হয়েছিল, জানেন ? শত্রু ছিল সংখ্যায় আমাদের তিনগুণ। বাধ্য হয়ে আমি সেকান্দার-শার ধরণে ব্যূহ রচনা করলাম আমার বল্লম-ধারীদের নিয়ে! কিন্তু কী মরিয়া ঐ ব্রিটনরা! দলে দলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো বল্লমের মুখে। যেমন করে কাবাবের মাংস শিকের মাথায় গাঁথা হয়, ঠিক সেই ভাবে তারা গেঁথে যেতে লাগলো বর্শায়! তাদের রক্তে আমাদের হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবে গেল যেন! ভয় হলো আমার, বুঝি শেষ পর্য্যন্ত—

হঠাৎ লিজিয়াকে সম্বোধন করে মার্কাস প্রশ্ন করলেন,—তুমি আমাদের যুদ্ধ-কৌশল বুঝতে পারবে লিজিয়া ?

লিজিয়া উত্তর দিল,—আমি শুধু বুঝতে পারছি, নিজের মাতৃভূমি রক্ষা করতে হলে মানুষকে বাধ্য হয়ে আত্মোৎসর্গ করতে হয়!

—মাতৃভূমি রক্ষা! তারা তো বিদ্রোহী! রোমের শত্রু! তবে হ্যাঁ, তাদের সাহসের তারিফ করবো। তুমি বীর সেনাপতির মেয়ে—তুমি বুঝতে পারবে নিশ্চয়, দুর্ব্বলকে হারিয়ে যারা সত্য বীর, তারা তেমন আনন্দ পায় না!

লিজিয়ার দিকে হাসিমুখে একবার তাকিয়ে মার্কাস ফিরলেন প্লতিয়াসের দিকে, প্রশ্ন করলেন,—ঠিক বলিনি সেনাপতি ?

—হয়তো ঠিকই বলেছো, কিন্তু আমি বুড়ো হয়েছি, বীরের দল কিসে আনন্দ পায়, তা আর আমার মনে নেই !

—ও, আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন, সেনাপতি !—এই বলে লিজিয়ার দিকে তাকিয়ে মার্কাস বললেন,—কিন্তু লিজিয়া, তোমার দেশের সৈনিকদের বীরত্বে তোমার তো উৎসাহ দেখছি না ! রোমানের মেয়ে হয়ে এ বিষয়ে এমন উদাসী !

—আমি রোমান নই !—ধীরে উত্তর দিল লিজিয়া।

সবিস্ময়ে মার্কাস লিজিয়ার পানে তাকিয়ে আছেন দেখে প্লতিয়াস তাঁর সংশয় দূর করবার জন্য বললেন—সত্যই লিজিয়ার জন্ম রোমে নয়। লিডিয়া রাজ্যের নাম শুনেছ, নিশ্চয়ই !—ও সেই দেশের রাজার মেয়ে। তাঁর সঙ্গে রোমের যুদ্ধ হয়, সে-যুদ্ধে আমিই ছিলাম সেনাপতি।

—ও, তার পর ?—উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মার্কাস।

—তারপর আর কি ! যুদ্ধে রোমের জয় হলো। লিজিয়ার বাবা বীরের মতন মৃত্যু বরণ করলেন সে-যুদ্ধে। তাঁর মন্ত্রীরা এসে সন্ধি করলেন।

মার্কাস ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন—সে সন্ধির সর্ত্ত-মত লিজিয়া বুঝি—

—তাই ! প্লতিয়াস বললেন,—সন্ধির সর্ত্ত যাতে ঠিক মানা হয়, তার জন্য জামিন-হিসাবে লিজিয়াকে রোমের হাতে ওরা অর্পণ করে। সম্রাটের কাছে আমিই লিজিয়ার লালনের ভার চেয়ে নিই বিশেষ চেষ্টা করে !

লিজিয়ার কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে পম্পেনিয়া বললেন—সেই থেকে লিজিয়া আমাদের মেয়ে।

—নিশ্চয়! রোম ওর উপর যে অত্যাচার করেছে, আমরা ব্যক্তিগত ভাবে যতখানি সম্ভব, তার প্রতিকারের চেষ্টা করছি। শিক্ষা, দীক্ষা কোনো দিক দিয়ে যাতে রোমের অভিজাত মহিলাদের চেয়ে লিজিয়া খাটো না হয়, সেই ভাবেই ওকে আমরা মানুষ করেছি।

লিজিয়া করুণ কণ্ঠে বললে,—শিক্ষা-দীক্ষা যতই হোক, রোম আমার দেশ নয়! আমার সেই লিডিয়া—সেই হলো আমার দেশ। একদিন সুখে সম্পদে সভ্যতায় কত বড় ছিল, এ কথা যেন জীবনে আমি না ভুলি!

সেই লিডিয়া!—সকৌতুকে বললেন মার্কাস।—কিন্তু আমরা জানি, অর্দ্ধসভ্য দেশ লিডিয়া। সে দেশের মেয়ে বলে তুমি গর্ব্ব করো?

উত্তর দিলেন পম্পেনিয়া—করে না? ওর নাম শুনেই তো বুঝতে পারছেন! ওর আসল নাম কোরিনা—জ্ঞান হতে সে-নাম ছেড়ে নাম নিয়েছে লিজিয়া, যাতে জন্মভূমির কথা মুহূর্ত্তের জন্য না ভোলে!

ভোজের পর্ব্ব শেষ হলো। মার্কাস আর ফেবিয়াস ছাউনিতে গেলেন। মার্কাসের মনে একমাত্র চিন্তা—ঐ লিজিয়া! তিনি বেরিয়ে এলেন। চাঁদের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। সোনালি জ্যোৎস্নায় লিলি-কুঞ্জের শোভা দেখবার জন্য মার্কাস ঘর থেকে বেরিয়ে

পড়লেন। হঠাৎ নজরে পড়লো ভিতর-উঠানে মর্ম্মর-বেদীর উপর বসে লিজিয়া। খড়ি দিয়ে মেঝেয় কি যেন আঁকছে!

মার্কাসকে দেখে তাড়াতাড়ি ছবিটা মুছে ফেললো। কিন্তু মার্কাস দেখলেন একটা মাছের ছবি। মাছ! এত জিনিষ থাকতে এমন নিবিষ্ট মনে মাছের ছবি আঁকছিল কেন?

লিজিয়ার সংযত শান্ত ভঙ্গী—মার্কাসের মনে হলো, ঔদ্ধত্য! দিগ্বিজয়ী বীরের সঙ্গে যে-মেয়ে নিজ থেকে হেসে কথা বলে না, সে-মেয়ের সম্বন্ধে রোমান বীরের ধারণা ভালো হতে পারে না! তাই মার্কাস মনে মনে উপায় খুঁজতে থাকেন যাতে এই উদ্ধত মেয়েটিকে আঘাত করা যায়! খাবার সময় তার জন্ম-পরিচয় পেয়ে মার্কাস বুঝলেন, তাঁর অনুমান মিথ্যা নয়! এ মেয়ে রোমান নয়। নিভৃতে লিজিয়ার দেখা পেতেই মার্কাসের মনে সে-কথা জেগে উঠলো। লিজিয়ার কাছে এসে তাই তিক্তকণ্ঠে তিনি বললেন—এখন? বড় মুখ করে তখন বলেছিলে—এ বাড়ীতে কোনো ক্রীতদাস নেই। যুদ্ধে বন্দী আর ক্রীতদাস—দুয়ে তফাৎ কী?

তাঁর কথার ভঙ্গীতে মর্ম্মাহত হয়ে লিজিয়া নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো, দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল ভিতর-বাড়ীর দিকে। মার্কাসের আরো রাগ হলো—বন্দিনী বালিকার এত তেজ!—তাঁর মত বীর সেনাপতিকে তুচ্ছ করে চলে যায়? পিছন থেকে দীপ্তকণ্ঠে তিনি বললেন,—ফেরো বন্দিনী, ফেরো!

লিজিয়া তাতে কর্ণপাত করলো না। সে-আহ্বানে ফিরেও তাকালো না। তখন দ্রুত তার পিছনে চললেন মার্কাস। দরজা

দিয়ে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল লিজিয়া। মার্কাস সেই দ্বারপথে প্রবেশ করতে যাবেন, এমন সময় দৈত্যের মত এক বিরাট মূর্ত্তি কোথা থেকে এসে তাঁর পথ আটকে দাঁড়ালো। মার্কাস ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, আর্শাস!

—পথ ছাড়ো!—আদেশের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন মার্কাস!

—না! আপনি লিজিয়ার পিছনে যেতে পাবেন না। প্রতিবাদ করে উঠে দৈত্য।

—কে আটকাবে?

—আমি! আমি একদিন লিজিয়ার বাবার দেহরক্ষী ছিলাম। এখন লিজিয়ার দেহরক্ষী।

—লিজিয়ার বাবাকে তুমি রক্ষা করতে পারোনি, লিজিয়াকেও পারবে না!—এই বলে পিছন ফিরে মার্কাস লিলি-কুঞ্জে প্রবেশ করলেন।

চারিদিকে ফুলের সুগন্ধ, জ্যোৎস্নার তরঙ্গ, কিন্তু মার্কাসের মনে আগুনের শিখা! নিজের মনের আগুনে তিনি তখন পুড়ে মরছেন।

* * * *

পরের দিন এশিয়া আর আফ্রিকা থেকে আর দুটি রোমান বাহিনী এসে উপস্থিত হলো রোমের উপকণ্ঠে। তখন নীরোর আদেশ প্রচারিত হলো, সম্মিলিত তিনটি সৈন্যদল একসঙ্গে বিজয়-শোভাযাত্রা করে প্রবেশ করবে রাজধানীতে—প্রাসাদের সামনে তাদের অভিবাদন জানাবেন স্বয়ং নর-দেবতা নীরো।

শোভাযাত্রার দিন সারা রাজধানী বেরিয়ে এলো রাজপথে।

বিশ্ব-বিজয়ী রোমান বীরদের অভ্যর্থনা করবার জন্য রোমের নর-নারী উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। রাজপথ জনসমুদ্রে পরিণত হলো। পথে লোকারণ্য। পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোক আছে সে লোকারণ্যে। ইহুদীর সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়েছে হাবসী; মিশরীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথে চলেছে পারসীক; একদিকে ব্রিটন, অন্যদিকে সিন্ধু-তীরবাসী ভারতীয়—গলা বাড়িয়ে দেখছে দিগ্বিজয়ী রোমান বাহিনীর জমকালো মিছিল।

সার-সার বল্লমধারী সৈনিক···রথের পর রথের শ্রেণী, ঊর্দ্ধে উড়ছে ঈগল-লাঞ্ছিত রোমের বিজয়-কেতন—খর রৌদ্রে আগুনের মত জ্বলছে ব্রোঞ্জের ঢাল। লক্ষ কণ্ঠের কোলাহল ছাপিয়ে উঠছে তূরী ভেরী জয়-ঢাকের সমুচ্চ একতান। বেদেরা নৃত্য করছে, বাজিকররা খেলা দেখাচ্ছে, সাপুড়ের বাঁশীর তালে তালে দুলে দুলে ফণা তুলছে কালকেউটে। পথের দু'পাশে প্রতি বাতায়নে শিশু আর নারীর ভিড়। পুরুষেরা সকলে রাজপথে। পথেও বহু নারী। তবে এঁরা অনেকে মুখোস পরে এসেছেন। কারণ, সাধারণ লোকের ভিড়ে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের দেখে কেউ চিনতে পারে যদি তাঁদের পক্ষে বড় লজ্জার কথা হবে!

শোভাযাত্রার প্রায় পুরোভাগে মার্কাস ভিনিসিয়াসের রথ। তেজী ঘোড়া পক্ষীরাজের মতন তাঁর সোনার গিল্টি-করা হাল্কা রথখানাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে! মার্কাস দৃঢ় হাতে লাগাম ধরে আছেন, একটু আল্গা পেলেই ঘোড়াগুলো পথের দু'পাশের লোকদের ঘাড়ে পড়বে! কিন্তু এ ভাবে পথ চলা—অতি বিরক্তিকর। মাঝে

মাঝে একেবারে থেমে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, মাথার উপর আগুন ঝরছে আকাশ থেকে, চোখ ঝলশে যায়, দেহ হয়ে আসে অবসন্ন! পাশ কাটিয়ে প্রিটোরিয়ান গার্ডের এক নায়ক যায় ঘোড়ায় চড়ে—তাকে ডেকে মার্কাস বললেন—এত দেরী কিসের, কাপ্তেন? নায়ক যেতে যেতেই জবাব দেয়—সম্রাট এখনো আসেননি! তিনি এলেই ভরী বাজবে। শুনতে পাবেন।

প্রাসাদ-চত্বরে দেবতাদের পূজার বেদী—দশটা বেদী হয়েছে—জুপিটার, জুনো, এপোলো প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রত্যেকের পূজা হচ্ছে স্বতন্ত্রভাবে। প্রতি দেবতার সামনে বলিদান হচ্ছে—কোথাও মেষ, কোথাও শূকর। রক্ত-স্রোতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেবদাসীরা হাত তুলে প্রণাম জানাচ্ছে—জাগো দেবতা! জাগো! জয় এপোলো··· জয় চিরজয়ী রোম!

সমবেত কণ্ঠে লক্ষ নাগরিক অমনি চীৎকার করে উঠছে! জয় চিরজয়ী রোম!

দেবতার পূজা যথারীতি শেষ হলো, তবু সম্রাট নীরোর দর্শন নেই! জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো! দশ দেবতার সমবেত শক্তি যে-নরদেবতার মধ্যে অধিষ্ঠান করেছে, সেই সীজারকে না দেখলে যে সব বৃথা হবে! জনতা অধীর ভাবে চীৎকার করে ওঠে—সীজার, দর্শন দাও সীজার! দেবতা, আবির্ভূত হও!

যেখানে সম্রাটের আবির্ভাব হবার কথা, ঐ সে অলিন্দ—প্রাসাদের গায়ে মণিমুক্তায় খচিত হয়ে জ্বল্‌জ্বল্ করছে। তার ওপারে পর্দার আড়ালে সম্রাট সিংহাসনে বসে আছেন পারিষদবর্গ নিয়ে। তিনি তখন

কাব্য-রসাস্বাদে তন্ময়। স্বরচিত কাব্য পড়ে শোনাচ্ছেন পারিষদদের। ট্রয় শহরকে কি ভাবে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল বিজয়ী গ্রীকরা, তার বর্ণনা। শুনতে শুনতে পারিষদের দল আনন্দে উচ্ছ্বসিত—প্রশস্তি বচনে মুখর হয়ে উঠলো শত মুখ। কেউ বললে—হোমারের পর এমন কাব্য আর কেউ লেখেনি। কেউ বললে, কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং যাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তাঁর পক্ষেই সম্ভব এরকম অতুলনীয় কাব্য রচনা!

সকলে থামলে পেত্রোনিয়াস বললেন—ও-সব বাজে কথায় কান দেবেন না সীজার! আমার কাছে সত্য কথা শুনুন। কবিতাটা আপনার উপযুক্ত হয়নি!

সকলে স্তম্ভিত! এ কী দুঃসাহস! এ কী নির্ব্বুদ্ধিতা! সম্রাটের কবিতার বিরূপ সমালোচনা! সম্রাটের গালে চড় মারাও এর চেয়ে নিরাপদ! পেত্রোনিয়াসের চির-প্রতিদ্বন্দ্বী তাইজেলিনাস উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এবার নীরো নিশ্চয় ক্ষেপে উঠবেন ওর উপর, আর তাহলেই তাইজেলিনাসের শত্রু নিপাত!

সম্ভাবনাও দেখা গেল সেই রকম। কাষ্ঠ-হাসি হেসে নীরো প্রশ্ন করলেন—কবিতাটায় দোষ কি হলো, দেখিয়ে দাও।

পেত্রোনিয়াস বললেন—দোষের কথা বলিনি। নীরোর উপযুক্ত হয়নি, বলেছি। হোমারের কলম থেকে বেরুলে ওকে ভালোই বলতাম! কিন্তু আপনার কাছ থেকে এর চেয়ে উঁচু জিনিষ প্রত্যাশা করি আমরা। তবে এ কথা বলবো, এ কবিতাটিতে আপনার প্রতিভা ঠিক স্ফূর্ত্তি পায়নি! সেজন্যে আপনার দোষ নেই। আগুনের

বর্ণনা দিচ্ছেন আপনি। কিন্তু এ-রকম আগুন আপনি স্বচক্ষে দেখেননি কোনোদিন! হোমার ট্রয়ের আগুন চোখে দেখেছিলেন, তাই তাঁর বর্ণনা অমন জীবন্ত হতে পেরেছে!

তাইজেলিনাস বললেন—তা হলে এক কাজ করা যাক্, কাঠ দিয়ে একটা নকল সহর তৈরী করে তাতে আগুন দেওয়া যাক্! সে আগুন দেখে—

কথা শেষ হলো না। পেত্রোনিয়াস উচ্চ হাস্য করে বললেন—সম্রাটকে নিয়ে পুতুল খেলা!

নীরো বললেন—তাই তো, কাঠের সহরে আগুন দেখে প্রেরণা পাবো আমি? রোমে যদি কোনোদিন আগুন লাগে—

—লাগালেই হলো!—বলে উঠলেন তাইজেলিনাস।

পেত্রোনিয়াস দেখলেন, সর্ব্বনাশ! এখনই বুঝি সম্রাটের সে খেয়াল জাগে! তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—দেবতা, বাইরে বহু লোক আপনাকে দর্শন করবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে!

নীরো সে-কথায় কান না দিয়ে বললেন—তোমাকে ধন্যবাদ পেত্রোনিয়াস! সত্যিকারের কবিতা তুমিই শুধু বোঝো। তাছাড়া সম্রাটের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে দেবার মতন মন আর সাহস একমাত্র শুধু তোমারই আছে! ধন্য আমি, এ-রকম বন্ধু পেয়েছি!

তাইজেলিনাস বাধা দিলেন সম্রাটের উচ্ছ্বাসে!—লোকের কি ভিড়! আপনার জন্য ওরা অধীর, সম্রাট!

সম্রাট রেগে উঠলেন—লোক! ভিড়! ওদের জন্য নিরিবিলিতে বসে দু'দণ্ড কাব্যচর্চ্চা করবো, সে উপায় নেই! এক-এক সময় আমার

কি মনে হয়, জানো ? মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের যদি একটি মাত্র গলা হতো, তা হ'লে আমি এক-কোপে সেটি দু'টুকরো করে নিষ্কণ্টক হতাম !

তাইজেলিনাস বললেন—যা মনে হয়, মুখে আদেশ করলেই সে আদেশ প্রতিপালিত হবে সম্রাট ! পৃথিবীর মানুষগুলোর প্রত্যেকের যদিও আলাদা-আলাদা গলা, তা হলেও, সবগুলো গলাই আমরা কেটে নামাতে পারি।

—কশাইয়ের কথা ! তীক্ষ্ণস্বরে বললেন পেত্রোনিয়াস। তারপর তাইজেলিনাসের ভ্রূকুটিতে দৃকপাত না করে তিনি বললেন—দেবতা, পৃথিবীতে মানুষ থাকবেই ! না থাকলে সম্রাট শাসন করবেন কাদের ? সম্রাটের ভোগ-বিলাস জোগাবার জন্য অর্থ দেবে কারা ? সম্রাটের কবিতা আবৃত্তি বা বাঁশী বাজানো শুনে বাহবা দেবে কারা ? মানুষকে থাকতেই হবে পৃথিবীতে, তার কারণ, মনুষ্যহীন পৃথিবীতে সম্রাট হয়ে কোনো আনন্দ নেই !

বিরক্ত হয়ে নীরো বললেন—থাকবে, থাকুক ! তাবলে আমায় এরা দেখতে চায় কেন ?

—না দেখলে ওরা বাঁচে কি করে ? পেত্রোনিয়াস উত্তর দিলেন—সূর্য্য না উঠলে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে থাকে ! সম্রাটের দর্শন না পেলে ওদের জীবন হয়ে ওঠে অন্ধকারময় ! কোটি কোটি মানুষের জীবনে আলো দেবার জন্য আপনার পৃথিবীতে আবির্ভাব ! নিজের সুখ-শান্তি আরাম-বিরামের দিকে না তাকিয়ে সে-আলো আপনাকে দিয়ে যেতে হবে বৈ কি, দেবতা !

নীরোর বিরক্তি কাটলো এই একান্ত পটু তোষামোদে। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি কক্ষের অপরদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সেখানে মহিষী পম্পিয়া দুটো চিতা-বাঘ নিয়ে খেলা করছিলেন! পম্পিয়া পূর্ব্বে ছিল নর্ত্তকী। মাতা আগ্রিপিনা এবং পত্নী অক্টেভিয়াকে হত্যা করবার পর নীরো একে বিবাহ করেন। একদিন যে ছিল নাচওয়ালী, আজ সে মহিষী! তার মনের গড়ন, তার চরিত্র কিন্তু মহিষীর উচ্চ আসনে উঠতে পারেনি! সেই হীন নর্ত্তকীর লোভ-লালসা তার মনে আজো ঠিক তেমনি বিরাজ করছে!

সম্রাটের ইঙ্গিতে পম্পিয়া উঠে এলেন—বাঘ দুটো সঙ্গে নিয়ে এলেন। সোনার শিকল ওদের গলায়। সেই শিকলের প্রান্ত এক কাফ্রী-দাসের হাতে। সেও সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে এলো। এদের নিয়ে অলিন্দে দেখা দিলেন নীরো। জনতা দেখতে চায় সম্রাটকে! সম্রাটের সঙ্গে তারা দেখলো নর্ত্তকী, দুটো চিতা বাঘ এবং এক কাফ্রী ক্রীতদাসকে! একদল চাটুকারও আছে সঙ্গে।

তবু লক্ষ কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠলো—দেবতা, হৃদয়-মন্দিরে আমরা নিত্য তোমাকে পূজা করি।

পেত্রোনিয়াসের দিকে তাকিয়ে নীরো বললেন—ঐ দূর থেকে আমায় অভিবাদন করছে—কে ও? খাশা মানিয়েছে ওকে!

পেত্রোনিয়াস বললেন—আমার ভাগ্নে!

সম্রাট বললেন—নিয়ে এসো ওকে, আমি পুরস্কার দেবো!

তিন

মার্কাস ভিনিসিয়াস যথাসময়ে পুরস্কার প্রার্থনা করলেন সম্রাটের কাছে। কি সে পুরস্কার, একটু পরে আমরা জানতে পারবো। এখন আমরা সম্রাট নীরোকে ছেড়ে যাই প্লতিয়াসের ভিলায়।

কাজে বেরিয়েছেন প্লতিয়াস,—পম্পেনিয়া লিলি-কুঞ্জে মর্ম্মর-বেদিকায় বসে সূচীশিল্পের কাজ করছেন।

লিজিয়া দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে সেদিন খড়ি দিয়ে সে মাছের ছবি এঁকেছিল!—মার্কাসকে দেখে ছবিটা তাড়াতাড়ি মুছে ফেলবার চেষ্টা করেছিল লিজিয়া—তাড়াতাড়িতে মোছা হয়নি ঠিকমত। অস্পষ্ট আধমোছা মাছের ছবির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে সেদিনকার সেই লজ্জা-ভয়ের মুহূর্ত্তগুলির কথা ভাবছিল। ভাবতে ভালো লাগছিল। ভালো লাগছিল মার্কাসের কথা ভাবতে। বাইরে নিজেকে নিশ্চিন্ত উদাসীন দেখাতে চাইলেও লিজিয়ার মনে মার্কাসের মূর্ত্তি ঘিরে চলেছে চপল তরঙ্গ লীলা!

শুধু নীরবে বসে চিন্তা করবার মত মন লিজিয়ার নয়। তার শিরায় যে-জাতের রক্ত, সে-জাতের মানুষও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। উদ্যম, আত্মনির্ভর, সাহস—তার জন্মগত সংস্কার। মার্কাসকে বিজয়-শোভাযাত্রার মধ্যে কি-রকম দেখায়, তা দেখবার জন্য সে রোমে গিয়েছিল। গোপনে গিয়েছিল—প্লতিয়াস বা পম্পেনিয়াকে না বলে! তার মুখে ছিল মুখোস। কেউ তাকে চিনতে পারেনি! মার্কাসের সঙ্গে সামনা-সামনি দেখাও হয়েছিল—মার্কাসের একবারও মনে হয়নি

ঐ হাস্যকর কাঠের মুখোসের আড়ালে যে-মুখ, তা তাঁর মনোহারিণী সুন্দরী লিজিয়ার !

মার্কাসকে দেখে এসে অবধি মার্কাসের কথাই ভাবছে লিজিয়া। হায়, মার্কাস যদি লিজিয়ার মত খৃষ্টান হতো ! তা হলে দু'জনের মিলনের কল্পনা সম্ভব ছিল ! লিজিয়া জানে, যিশুকে যে অন্তর দিয়ে জেনেছে, তার কাছে বংশ-গৌরব বা আভিজাত্যের কোন মূল্য নেই ! তিনি শিখিয়েছেন মানুষকে মানুষ-হিসাবে দেখতে। বেদনার ক্রসে আত্মদান করে জগৎকে তিনি এই কথাই জানিয়ে গিয়েছেন যে, আকাশের নীচে সকলেই ঈশ্বরের সন্তান ! সেখানে রোমান আর ইহুদী আর হাবসীর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই ! লিজিয়া গোপনে নিজেকে সেই যিশুর চরণে উৎসর্গ করেছে। তখন রোমে যিশুর নাম উচ্চারণ করবারও উপায় ছিল না। সেদিনকার রোমানরা যিশুকে স্বীকার করতো না। খৃষ্টানদের তারা হীন ইতর বলে ঘৃণা করতো।

লিজিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব কথা ভাবছে। এমন সময় বাইরের দরজায় সবলে আঘাত করে কে পরুষ-কণ্ঠে চীৎকার তুললো—দরজা খোলো ! সম্রাটের হুকুম—দরজা খোলো !

পম্পেনিয়া আর লিজিয়া দু'জনেই চমকে উঠলেন। সম্রাটের হুকুম ! যার নাম শুনলে মানুষ ভয় পায়, তার হুকুম ? কে না জানে নীরোর স্বভাব ? নারীর মর্য্যাদা, পুরুষের জীবনের এক পয়সা মূল্য নেই তার কাছে ! কে না জানে নিজের মাতাকে হত্যা করেছিল, নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছিল—কত সেনাপতি সেনেটরকে হত্যা

করেছে এই নীরো। সেই নীরোর হুকুম এই নিভৃত পল্লীগৃহে কি কারণে? কোন্ সর্ব্বনাশের পূর্ব্বাভাস এ?

দ্বারে ঘন-ঘন করাঘাত। দ্বার খুলে না দিলে পদাঘাতে ভেঙে ফেলবে ওরা! তাতে শুধু তিক্ততারই সৃষ্টি হবে! বাধ্য হয়ে পম্পেনিয়া দাসদের বললেন দরজা খুলে দিতে।

খোলা দরজার ও-পিঠে একদল প্রিটোরিয়ান গার্ড—সম্রাটের দেহরক্ষী বাহিনী। তাদের একজন সৈনিক এগিয়ে এলো প্রাঙ্গণে। এসে পম্পেনিয়াকে অভিবাদন জানালো—শুষ্ক সৌজন্য। তার হাতে সরকারী চিঠি।

সে চিঠি পম্পেনিয়ার হাতে দিয়ে সৈনিক বললে—সম্রাটের হুকুমে যুদ্ধবন্দিনী লিডিয়ার রাজকন্যাকে এখনই আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে হবে—প্রাসাদে।

সেই মুহূর্ত্তে যদি নির্মেঘ আকাশ থেকে সশব্দে বাজ পড়তো, তা হলেও তাঁরা এর চেয়ে বেশী চমকিত বা ভীত হতেন না! চমকের প্রথম বেগ কাটিয়ে পম্পেনিয়া কম্পিত-কণ্ঠে কোনো রকমে বললেন—এ কি করে হতে পারে? লিজিয়া যুদ্ধবন্দিনী ছিল; কিন্তু সম্রাট নিজে তাকে আমাদের হাতে দিয়েছেন তার লালন-পালনের জন্য। সেই থেকে মেয়ের মত তাকে আমরা মানুষ করছি। সে এখন আমাদের মেয়ে।

পরুষ শুষ্ক কণ্ঠে সৈনিক বললে—আমি অত জানি না। সম্রাটের হুকুম পালন করা আমার কাজ। আর সম্রাটের আদেশ-লিপি আপনি দেখলেন!

—তবু—তবু—আমার স্বামী বাড়ী নেই এখন। তিনি এসেই সম্রাটের কাছে দরবার করতে যাবেন। আমাদের প্রার্থনা নামঞ্জুর হবে না। আমাদের উপর সম্রাটের অসীম অনুগ্রহ। এক সময়ে আমার স্বামী সম্রাটের জন্য প্রচুর রক্ত ক্ষয় করেছেন।

সৈনিক বললে—প্রার্থনা আর দরবার পরের কথা। এখন আমার কর্ত্তব্য, হুকুম মানা। আগে লিজিয়াকে পাঠিয়ে দিন আমার সঙ্গে, তারপর প্রার্থনা করবেন। প্রার্থনা যদি মঞ্জুর হয় তখন অনায়াসে আবার আপনাদের পালিতা মেয়েকে আপনারা ফিরিয়ে আনবেন।

লিজিয়া তখন পম্পেনিয়ার বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এমন বিপদ তার ঘটতে পারে, সে স্বপ্নেও ভাবেনি!

স্নেহময় প্লতিয়াস, মমতাময়ী পম্পেনিয়া—নিজের মা-বাপের মতই সে এঁদের ভালোবেসেছে এতদিন। নিজের মা-বাবা, নিজের আত্মীয়-জন—তাদের কথা মনে নেই আজ—সব-কিছুর পূরণ হয়েছে তার এই নতুন মা-বাপের স্নেহে মমতায়। এঁদের আশ্রয়ও তার ভাগ্যে সইলো না আর!

পম্পেনিয়াও দুঃখে বেদনায় মূর্চ্ছাতুর! তিনি অনেক কিছু দেখেছেন জীবনে। দেখেছেন বিপদে আত্মহারা হলে বিপদ আরও জটিল হয়ে ওঠে! এখন সম্রাটের আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য—তা না করলে এরা প্লতিয়াসের ইজ্জৎ রাখবে না! জোর করে টেনে নিয়ে যাবে লিজিয়াকে! তার চেয়ে লিজিয়াকে পাঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার রক্ষার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত।

তিনি লিজিয়াকে নিয়ে ভিতরে গেলেন। সৈনিককে বলে গেলেন —আমি ওর পোষাক বদলে এখনই এনে দিচ্ছি।

ভিতরে গিয়ে লিজিয়াকে তিনি সান্ত্বনা দিলেন—যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কাঁদতে-কাঁদতে লিজিয়া পোষাক বদলাতে গেল। তার এতদিনের যত্নে-গড়া সুখ-স্বর্গ দানব নীরোর পদাঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল! কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও মনে বিস্ময়তার চমক! নীরোর হঠাৎ কি প্রয়োজন তাকে নিয়ে? নীরো দুশ্চরিত্র, সকলে জানে। কিন্তু নীরো তাকে কখনো চোখে দেখেননি! না দেখে লিজিয়াকে অন্দরে পোরবার জন্য কেন তাঁর এ আগ্রহ?

লিজিয়াকে বেশ পরিবর্ত্তন করতে পাঠিয়ে পম্পেনিয়া একখানা চিঠি লিখতে বসলেন। রাজ-অন্তঃপুরবাসিনী তাঁর এক পরিচিত মহিলাকে। তাঁকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন—যাতে সম্রাটের ওখানে লিজিয়ার উপর তিনি নজর রাখেন।

যাঁকে চিঠি লিখলেন তাঁর নাম আক্তি। নীরোর বিরাট অন্দরের প্রতিহারী। পম্পেনিয়ার সঙ্গে তাঁর বহুদিনের পরিচয়।

চিঠি লিখে লিজিয়ার হাতে দিলেন। লিজিয়া বুকের আবরণে লুকিয়ে রাখলো। তারপর বাইরে এসে সাশ্রুনেত্রে পম্পেনিয়া সৈনিকের হাতে লিজিয়াকে সমর্পণ করলেন। হঠাৎ সামনে এগিয়ে এলো আর্শাস!

সৈনিকের ভ্রূকুটির উত্তরে নম্রভাবে সে বললে—লিজিয়া রাজকন্যা। সন্ধির সর্ত্ত-মত লিজিয়া যখন রোমের হাতে এলো, তখন সর্ত্ত ছিল, রাজকন্যার পরিচর্য্যা আর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমি আর্শাস

তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো চিরদিন। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত আমি ওর সঙ্গে আছি। এখনও আপনি আমাকে ওর সঙ্গে যেতে দেবেন, আশা করি।

সৈনিক এতে আপত্তি করবার কিছু পেলে না। লিজিয়াকে সম্রাটের অন্তঃপুরে পৌঁছে দেওয়া তার কাজ। সে দায়িত্ব পালন করতে সে যদি আর একটা লোককে সেখানে নিয়ে যায়, তাতে কি ক্ষতি! সম্রাট যদি আর্শাসের সম্বন্ধে আপত্তি করেন, তিনিই ওকে তাড়িয়ে দেবেন!

আর্শাস চললো লিজিয়ার ডুলির সঙ্গে সঙ্গে। তাকে সঙ্গে পেয়ে নৈরাশ্যের অন্ধকারে আলোর রশ্মি দেখলো লিজিয়া!

ডুলি একেবারে নীরোর অন্তঃপুরে গিয়ে থামলো। সেখানে আর আর্শাস যেতে পেলো না—সে রইলো বাইরে রক্ষীদের মহলে। লিজিয়াকে একটা ছোট ঘরে এনে সেখানে অপেক্ষা করতে বলা হলো।

সেখানে এলেন আক্তি। ক-বছর আগেও তিনি অসামান্য সুন্দরী ছিলেন, এখনো তাঁকে দেখলে বোঝা যায়! এখনো সে সৌন্দর্য্যের ছায়া তাঁর অঙ্গ লেপে যেন রয়ে গিয়েছে। রোগে নয়, শোকে, তাপে মনের জ্বালায় যেন দ্রুত তিনি শুকিয়ে গিয়েছেন। একদিন এমন আশা তাঁর ছিল, রোমের মহিষীর আসনে তিনিই বসবেন! কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো নর্ত্তকী পম্পিয়া! সেই থেকে বিলাসিতার জৌলুস তাঁকে আর আকর্ষণ করতে পারে না! লোকে এমন কথাও বলে, নব-প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্মের উপর তাঁর নাকি কিঞ্চিৎ

আসক্তি হয়েছে। সম্রাটের জেনানা-মহলের তদারক করতে করতে রোমের দরিদ্র নিপীড়িত খৃষ্টানদের সঙ্গে যোগ রেখেছেন নিয়মিত। অবশ্য একান্ত গোপনে। এইভাবেই তাঁর আলাপ হয় পম্পেনিয়ার সঙ্গে,—পম্পেনিয়া আর প্লতিয়াস যে খৃষ্টান-ভক্ত তা তাঁরা গোপন করেন না! গোপন করবার উপায় নেই, কারণ খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান আচার্য্য পল তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

পম্পেনিয়ার চিঠি পেয়ে আক্তি একবার লিজিয়াকে ভালো করে দেখলেন, তারপর নিশ্বাস ফেললেন। এই সরলা নির্ম্মলা বালিকার অদৃষ্টে না জানি কত দুর্গতি আছে! আক্তি নিজে যখন প্রথম এসেছিলেন এই প্রাসাদে, তখন তিনিও ছিলেন এইরকম পবিত্র,—পাপের লেশমাত্র স্পর্শ ছিল না তাঁর চরিত্রে। কিন্তু কোথায় আজ নেমে এসেছেন! প্রলোভনে আত্মরক্ষার সামর্থ্য রইলো না! এরও হয়তো সেই রকম হবে। পম্পেনিয়া কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন চিঠিতে কিন্তু আক্তির সাধ্য কি, নীরোর ইচ্ছায় বাধা দেবেন!

দাসীরা এসেছে লিজিয়ার প্রসাধনের উপকরণ নিয়ে। লিজিয়াকে স্নান করিয়ে, কাপড় গহনা পরিয়ে, চুল বেঁধে, আতর মাখিয়ে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী করে তুললো তারা। আক্তি বললেন—সম্রাটের ভোজ-সভায় তাকে যেতে হবে আজ সন্ধ্যায়। সম্রাটের আদেশ। এর অন্যথা হবার উপায় নেই!

লিজিয়ার সারা অঙ্গ কেঁপে উঠলো অজানা ভয়ে। নীরোর ভোজ-সভা! বিভীষিকার ব্যাপার! লোভ আর লালসার লীলাভূমি! পাপের নিরঙ্কুশ রাজত্ব ওখানে! নীরোর ভোজ-সভার গল্প সে

শুনেছে সকলের মুখে। সত্য আর কল্পনায় মিশে সে সব কাহিনী যেভাবে প্রচারিত হয়, তা শুনলে যে কোন নিরীহ গৃহস্থ-কন্যার মূর্চ্ছা হবার কথা! সেই ভোজ-সভায় যেতে হবে শুনে লিজিয়া ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে অপরিচিতা আক্তিকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো—আমি যাবো না! আমি যাবো না! আমি যাবো না!

হায় বালিকা! 'যাবো না' বললে কি নীরোর কবল থেকে রেহাই পাওয়া যায়? আক্তি তাকে বোঝাতে বসলেন। কিন্তু কী বোঝাবেন? লিজিয়া ভয় পেয়েছে—সে-ভয় মিথ্যা নয়, আক্তি জানেন! জেনে শুনে কী করে সরলাকে মিথ্যা স্তোক বাক্যে ভোলাবেন? এ প্রতারণা কি বলে করবেন? কী করে বলবেন—ওখানে ভয় নেই—তুমি নিশ্চিন্ত হও?

না, তা বলতে পারলেন না। শুধু বললেন—আমি দেখবো যাতে তোমার কোনো বিপদ্ না হয়!

তবু লিজিয়া আশ্বাস পায় না!

আক্তি পাউডারের কৌটোটা উপুড় করে ফেললেন টেবিলের উপর। পাউডার ছড়িয়ে পড়লো। তার উপর আঙ্গুল দিয়ে আক্তি একটা ছবি আঁকলেন। লিজিয়া সবিস্ময়ে দেখে—মাছের ছবি!

আক্তি মাছের ছবি এঁকেছেন! এ সঙ্কেত শুধু খৃষ্টানরা আঁকে পরস্পরকে পরিচয় দিতে। পম্পেনিয়ার পালিতা কন্যা লিজিয়া, কাজেই খৃষ্টধর্ম্মের সঙ্কেত তার অজানা থাকবার কথা নয়। এই ভেবেই আক্তি এঁকেছেন এ-ছবি। তাঁর আশা পূর্ণ হলো। আক্তিকে

খৃষ্টান বলে বুঝতে পেরে লিজিয়ার দুশ্চিন্তার উপশম হলো। গহন অরণ্যে সে যেন পথ দেখতে পেলো এবার! অমানিশার আঁধারে কে যেন তার হাতে এনে দিলে মশাল! পরিপূর্ণ বিশ্বাসে সে এবার আক্তির পানে চাইলো।

আক্তি তাড়াতাড়ি পাউডারে-আঁকা ছবি মুছে ফেললেন।

* * * *

ঘরের পর ঘর পার হয়ে, সিঁড়ির পর সিঁড়ি উঠে নেমে, অলিন্দের পর অলিন্দ, চত্বরের পর চত্বর পেরিয়ে আক্তি লিজিয়াকে এনে দাঁড় করালেন প্রশস্ত বারান্দায়। সেখানে সশস্ত্র রক্ষীর পাহারা মোতায়েন। আবলুশ কাঠের দরজায় সোনালি পর্দা ঝুলছে। পর্দার ওধার থেকে আসছে আলোর তীব্র ঝলক আর শোনা যাচ্ছে প্রমত্ত কণ্ঠের সমুচ্চ-হাসি। সেইখানে এসে আক্তি একজন সৈনিককে ইসারা করে কাছে ডাকলেন।

আক্তিকে সৈনিক চেনে। সসম্ভ্রমে নমস্কার জানালো তাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে—এ কে?

—যুদ্ধবন্দিনী লিজিয়া! উত্তর দিলেন আক্তি।

—ও! ওঁকে তো আজ ভোজের সভায় হাজির করবার কথা আছে। এই বলে সৈনিক লিজিয়াকে ইঙ্গিত করলো তাকে অনুসরণ করবার জন্য। লিজিয়া ভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ালো আক্তির গা ঘেঁষে। আক্তি তাকে সামনে ঠেলে দিয়ে কাণে কাণে বললেন—যাও, না গিয়ে উপায় নেই!

কাতর কণ্ঠে লিজিয়া বললে—আপনি আসবেন না?

—না! মলিন হাস্যে আক্তি উত্তর দিলেন—আমাকে হাজির হবার জন্য হুকুম সম্রাট দেন! হুকুম ছাড়া ওখানে কেউ যেতে পারে না।

বিশাল কক্ষ। প্রাচীর আর মেঝে বহুবর্ণ মর্ম্মরে মণ্ডিত। ছাদ আকাশের মত নীল, তা থেকে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত বহু দীপাধার—আলোর ফিনকী ফুটছে। কক্ষতলে সুগন্ধি মশাল সারি সারি বসানো—তা থেকে আলো আর গন্ধ উৎসারিত হচ্ছে নির্ঝর-ধারার মত। আরও কত মশাল নীচু স্তম্ভের মাথায়—তা থেকেও সুগন্ধ নিঃসৃত হচ্ছে।

কক্ষতলের মাঝখানে বৃহৎ জলাধার। সেখান থেকে উঠছে রামধনু-রঙা ফোয়ারা। চারিধারে নানা বর্ণের ফুল সাজানো। ফুলের টবগুলি অগুন্তি মর্ম্মর-মূর্ত্তির আড়ালে সুকৌশলে লুকানো। মূর্ত্তিগুলি প্রধানতঃ কামদেবের, রতিদেবীর এবং সুরার দেবতা বাকাশের।

কক্ষের চার দেওয়ালের পাশে সারি সারি সুখাসন সজ্জিত। দু-তিনখানি করে মখমলে-মোড়া সোফা মুখোমুখি বসিয়ে এক একটা বৈঠকের মত তৈরী করা হয়েছে। তার প্রত্যেকটাতে এক-একদল আরামে অর্দ্ধশায়িত হয়ে সুরা পান করছে। ভোজ এখনো আরম্ভ হয়নি, সম্রাট এসে পৌঁছোননি!

অবশেষে শোনা গেল সৈনিকদের জয়ধ্বনি···তার্পনসের বীণার ঝঙ্কার এবং আমন্ত্রিত অভিজাতদের আনন্দ-গুঞ্জন। সীজার, স্বাগত! স্বাগত জুপিটার-পুত্র নীরো! স্বাগত পৃথিবীর জাগ্রত দেবতা!

নীরো প্রবেশ করলেন পার্শ্বদ্বার দিয়ে, তাঁর পশ্চাতে সম্রাজ্ঞী

পম্পিয়ার সঙ্গে সেই দুই চিতা-বাঘ, আর সেই ব্যাঘ্র-যুগলের সোনার শিকল হাতে কাফ্রী দাস।

সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোনিয়াস, তাইজেলিনাস ; সকলে এলেন।

ভোজ সুরু হলো একতান-বাজনার সঙ্গে। নানা-রকমের বিচিত্র তন্ত্রী থেকে সুরের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়লো ভোজ সভাকে পরিব্যাপ্ত করে —সুন্দরী ক্রীতদাস-তরুণীরা নানা ভোজ্য-পানীয়ের পাত্র হাতে আনাগোনা সুরু করে এদিকে ওদিকে। সম্রাট আসন গ্রহণ করবার পরই অতিথিরা যে যার আসন অধিকার করেছিলেন, এইবার সম্রাটের অনুমতি নিয়ে রসনার তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হলেন সকলে। কী আয়োজন! কী বিপুল সমারোহ! এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ তিন মহাদেশের যেখানে যা কিছু সুস্বাদু ভোজ্য আছে, সমস্ত এনে একত্র করা হয়েছে নীরোর ভোজে।

সৈনিকরা লিজিয়াকে এনে বসিয়ে দিয়েছে কোণে একটা সোফায় উজ্জ্বল দীপালোকের নীচে। একা বসে লিজিয়া,—ভয়ে কাঁপছে, শিউরে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। এ-রকম উচ্ছৃঙ্খলতার দৃশ্য জীবনে সে দেখেনি! এমন শালীনতা-বর্জ্জিত ভাষা জীবনে শোনেনি! চোখ নীচু করে সে সোফার এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে,—হঠাৎ তার কাণে আসে মৃদু হাসির শব্দ! চকিতে মুখ তুলে সে দেখে, সামনে পুরুষের দলে তার পরিচিত—মার্কাস ভিনিসিয়াস! সঙ্গে আর একজন। তাকে সে চেনে না।

এই অচেনা মানুষটিই হেসেছিল। লিজিয়ার ভীত চকিত ভাব দেখে সে মার্কাসকে বললে—তোমার পছন্দর তারিফ না করে পারছি

না! তবে একদম গেঁয়ো। একে মনের মত করে নিতে হলে বহু সাধনা করতে হবে—তাতে অনেক মেহনৎ!

অচেনা লোকটি পেত্রোনিয়াস। এঁর সুপারিশে নীরো লিজিয়াকে প্লতিয়াসের কাছ থেকে এনে মার্কাসের হাতে সঁপে দিয়েছেন—এই পুরস্কারই মার্কাস চেয়েছিলেন নীরোর কাছে এবং নীরো তা মঞ্জুর করেছেন। লিজিয়াকে একবার দেখে পেত্রোনিয়াস সম্রাটের আসনের দিকে চলে গেলেন—, মার্কাস আসন গ্রহণ করলেন লিজিয়ার পাশে। পেত্রোনিয়াসের ব্যবস্থামত সেখানে আর কারও বসবার অনুমতি ছিল না।

ব্যঙ্গভরে মার্কাস বললেন—তোমায় এখানে একা দেখছি যে, লিজিয়া! তোমার চিরদিনের অনুরক্ত রক্ষক সেই আর্শাস দৈত্যটি কোথায়?

লিজিয়া উত্তর দিলে না।

—তবে কি, তুমি আর্শাসের সঙ্গ ত্যাগ করে এসেছো?

আর্শাসকে সে ত্যাগ করে আসেনি—সে এই প্রাসাদের সীমানাতেই আছে—সে কথা না বলে লিজিয়া বললে—মানুষকে অনেক কাজ বাধ্য হয়েই করতে হয়!—সে বলতে যাচ্ছিল, কি ভাবে সম্রাটের সশস্ত্র সৈনিকেরা বাড়ী থেকে তাকে ধরে নিয়ে আসে···

কিন্তু কথা আর অগ্রসর হলো না। সম্রাট তাঁর উচ্চাসন থেকে নেমে এলেন। সমাগত অতিথিদের সামনে এসে একবার প্রত্যেকের সঙ্গে সৌজন্য-বিনিময় করা সম্রাটের রীতি।

প্রথমেই তিনি এসে দাঁড়ালেন লিজিয়া আর মার্কাসের সামনে।

লিজিয়াকে ভালো করে দেখে তিনিও পেত্রোনিয়াসের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। বললেন—তোমার পছন্দর তারিফ করি, ভিনিসিয়াস।

তারপর লিজিয়াকে সম্বোধন করে বললেন—সন্ধির প্রতিভূদের উপর সম্রাটের যে অধিকার আছে, তার বলে আমি তোমাকে অর্পণ করেছি মার্কাস ভিনিসিয়াসের হাতে। তুমি ওঁর সঙ্গে ওঁর গৃহে যাবে। আজ থেকে তুমি ওঁর সম্পত্তি!





উপরে বামে ঃ—জলস্রোতের মত জনস্রোত

দক্ষিণে ঃ—সম্মুখে কালো ধোঁয়ার রাজ্য

নিম্নে ঃ—আকাশের দিকে চেয়ে জুপিটার বা জুনোর কাছে করুণা ভিক্ষা করছে

[ছবি—মেট্রো গোল্ডউইনের সৌজন্যে

চার

সম্রাট তাঁর আদেশ জানিয়ে অন্য অতিথিদের খাতির করতে গেলেন।

দুচোখে বিজয়-গর্ব্বের দীপ্তি—মার্কাস তাকালেন লিজিয়ার দিকে কিন্তু লিজিয়া তখন পাথর হয়ে গিয়েছে! এমনি কিছু ঘটবে তার ভাগ্যে,—তা বুঝলেও এত শীঘ্র তা ঘটবে,—এটুকু ছিল তার কল্পনার অতীত।

এমন নির্লজ্জ হতে পারে মানুষ? নারীর নারীত্ব—বাজারের পণ্য? নারী মানুষ নয়? লিজিয়া কি কুকুর ঘোড়ার মত জানোয়ার—যে যার খুশী হবে, তাকে নেবে! ইচ্ছামত নীরো তাকে দান করবেন যাকে খুশী! কৈ, তার খৃষ্টধর্ম্ম তো এ কথা বলে না! আচার্য্য পলের উপদেশ সে শুনেছে প্লতিয়াসের বাড়ীতে! একজন মানুষকে আর-একজন মানুষের উপর প্রভুত্ব করবার অধিকার প্রভু যীশু দিয়ে যাননি! ভুল! কিন্তু ভুল কার? সম্রাটের? না, খৃষ্টের? নিশ্চয় ঐ দাম্ভিক সম্রাটের ভুল!

কিন্তু বেশীক্ষণ চিন্তার অবসর পেলো না। মার্কাসের ইঙ্গিতে একজন সৈনিক এসে লিজিয়ার সামনে দাঁড়ালো। মার্কাস আদেশ দিলেন—এই বালিকাকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও আক্তির কাছে। তাঁকে বলবে, একে সম্রাট আমায় পুরস্কার দিয়েছেন। অন্তঃপুরের খাতায় যে-সব সুন্দরীর নাম লেখা আছে—সে খাতা থেকে এর নাম কেটে একে যেন তিনি এখনই তোমার সঙ্গে পেত্রোনিয়াসের বাড়ী পাঠিয়ে

দেন! প্রাসাদের অঙ্গনে শিবিকা অপেক্ষা করবে—আমি ব্যবস্থা করেছি।

এই বলে দীর্ঘ পদক্ষেপে মার্কাস সম্রাজ্ঞীর দিকে গেলেন—সম্রাজ্ঞীকে সম্মান নিবেদন না করে ভোজ-সভা ত্যাগ করা চলে না। চিরাচরিত রীতি! এ রীতি না মানলে সম্রাজ্ঞীর ক্রোধ হবে। কাজ কি অকারণে অমন পরাক্রান্ত ব্যক্তির কোপে পড়া!

লিজিয়াকে নিয়ে রক্ষী চলে গেল আক্তির কাছে।

লিজিয়ার মুখ বিবর্ণ। আক্তিকে সে কিছুই বলতে পারলো না। বলবার প্রয়োজনও ছিল না! যা জানাবার, রক্ষী জানালো—অত্যন্ত সংক্ষেপে, নীরস ভাষায়! আক্তির ক্ষমতা থাকলে এই রূঢ়ভাষী সৈনিকটাকে চাবুক মেরে অন্তঃপুরের সীমা থেকে বার করে দিতেন! কিন্তু সে ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই তিনি লিজিয়াকে বললেন তৈরী হতে, এবং তার জামার গলাবন্ধ ঠিকমত পরিয়ে দেবার ছলে কাছে এসে কাণে কাণে তাকে বললেন—ভয় পেয়ো না। আর্শাস তোমার শিবিকার সঙ্গে যাবে। যা-কিছু করবার, পথেই সে করবে।

কী করবে আর্শাস? লিজিয়া কল্পনা করতে ভয় পায়! সে পারবে লিজিয়াকে উদ্ধার করতে? নরক থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারবে—একার বাহুবলে নির্ভর করে? কল্পনা করতেও লিজিয়ার সাহস হয় না—পাছে নৈরাশ্যের বেদনায় আরো কষ্ট পেতে হয়!

লিজিয়াকে নিয়ে রক্ষী কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো। আক্তি জানালা খুললেন—খুলে একখানা সাদা রুমাল নাড়তে লাগলেন সেই বাতায়ন-পথে। দূরে প্রাচীরের পাশে দৈত্যের মত প্রকাণ্ড একটা

লোক চুপ করে দাঁড়িয়েছিল—গবাক্ষের দিকে ফিরে এক-দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে! সেই সাদা রুমালের সঙ্কেত সে দেখলো—দেখেই দ্রুত পায়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল।

এ লোক আর্শাস। প্রথম থেকেই সে আক্তির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে। মার্কাসের অনুরোধেই যে সম্রাট লিজিয়াকে কেড়ে এনেছেন, এবং মার্কাসের গৃহে তাকে পাঠিয়ে দেওয়াই সম্রাটের অভিপ্রায়, এ খবর আক্তি আগেই আর্শাসকে দিয়েছেন। আর্শাস তাই প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল।

জীবন দিয়েও সে প্রভু-কন্যাকে এ লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবে! স্বাধীন দেশের রাজকন্যা! অসহায় সরলা বালিকা! ফুলের মত জীবন! এখানে এ নরকের আগুনে তিলে তিলে জ্বলে ছাই হবে—আর্শাসের জীবন থাকতে তা হতে পারে না!

সে বেরিয়ে গেল প্রাসাদ থেকে। তার সঙ্কল্প স্থির।

* * * *

পেত্রোনিয়াসের ঘরে মহোৎসব। সম্রাটের ভোজ-সভা থেকে ছুটি পাওয়া মাত্র তিনি বাড়ী ফিরে এসেছেন। তাঁর আদেশে সেইরাত্রে নৃত্য-গীত-বাদ্যের আয়োজন হয়েছে! ভৃত্যেরা অতিথি-সেবার আয়োজনে ব্যস্ত। বড় বড় আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়ীর সামনে। বাড়ীর সামনে রাস্তাও উৎসব-সজ্জায় ঝল্‌মল্ করছে।

মার্কাসও এসে পড়েছেন। তিনি মাতুলের কাছেই বাস করছেন এখন। এইখানেই লিজিয়াকে এনে তোলা হবে। তারপর তাকে নিয়ে মার্কাস যাবেন তাঁর জমিদারীতে,—সিসিলি দ্বীপে।

উদ্‌গ্রীব হয়ে মার্কাস ঘর-বার করছেন! অনেকক্ষণ আগেই লিজিয়াকে নিয়ে সৈনিকদের আসা উচিত ছিল! দেরী হচ্ছে কেন? আক্তি আটক করে রেখেছে? না,—তা কখনো সম্ভব হতে পারে না। সম্রাট আদেশ দিয়েছেন—লিজিয়াকে মার্কাসের গৃহে পৌঁছে দিতে। সে আদেশ অমান্য করবার সাহস আক্তির কখনো হবে না!

তবে কী কারণ হতে পারে, যার দরুণ লিজিয়ার আসতে এত দেরী হচ্ছে? মার্কাস বার-বার পেত্রোনিয়াসকে জিজ্ঞাসা করছেন; বার-বার একই উত্তর পেয়ে ফিরে আসছেন। সান্ত্বনার ছলে রসিক মাতুল বলেন—মেয়েদের নানা ঝামেলা, বাপু! পোষাক বদলাতেই একটা পূরো প্রহর কেটে যায়। তার উপর যদি সজ্জা-ভূষণ হয়, তাহলে কথাই নেই! সামলে উঠতে কেটে যায় গোটা একটা দিন তাদের! তুমি উতলা হয়োনা। এখন হোক, দু'দণ্ড পরেই হোক, সে আসবেই!

কিন্তু পেত্রোনিয়াসের সে কথা মিথ্যা হলো। যে-সৈনিকের উপর লিজিয়াকে নিয়ে আসার ভার, সে একা ফিরে এলো। এবং অক্ষত দেহে নয়, সারা দেহে জখমের রক্তাক্ত চিহ্ন নিয়ে। সর্ব্ব শরীর বয়ে রক্ত ঝরছে—মাথা থেকেও—একটা পাথর বা লাঠির আঘাত লাগলে যেমন হয়।

সে যে-বৃত্তান্ত দিলে, তা অদ্ভুত। তার সঙ্গে আরও তিনজন রক্ষী ছিল। দৈত্যের মত প্রকাণ্ড একটা লোক হঠাৎ অন্ধকারে লাফিয়ে এলো, এসেই আঘাতের পর আঘাত চালালো রক্ষীদের মাথায়। দু'জন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, বাকী দু'জন দু'এক ঘা খেয়েই ছুট দিল

ঊর্দ্ধশ্বাসে! শিবিকার বাহকরা—অবস্থা দেখে আগেই শিবিকা ফেলে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিল।

লিজিয়া? জ্ঞান হতে সৈনিক লিজিয়াকে আর দেখতে পায়নি, সর্ব্বত্র খুঁজেছে! কোথাও পায়নি, না শিবিকায়, না পথে, না কোথাও! রাত্রি গভীর, সহরতলির ও-অংশটা নির্জ্জন, কাজেই কোন পথিক বা আর কারো সাহায্য পাবার আশা ছিল না! অগত্যা সৈনিক এসেছে মার্কাসকে এই দুঃসংবাদ দেবার জন্য। আর একজন আহত রক্ষী এখনো পথে প'ড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে!

বিবরণ শোনার সঙ্গে সঙ্গে মার্কাসের মূর্ত্তি গেল বদলে। সারা দেহ তাঁর কঠিন হয়ে উঠলো—চোখে মুখে যেন আগুনের শিখা জ্বলে উঠলো! দু'হাতে মাথার চুল মুঠি করে ধরে টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলেন! এত জোরে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেন যে সত্যই রক্ত ঝরে সেখান থেকে! মার্কাসের বুঝতে দেরী হলো না, এ নিশ্চয় সেই আর্শাসের কাজ। আপনার মনে বলে ওঠেন,—এত সাহস! ঐ পশু আর্শাসের এতদূর স্পর্দ্ধা! মার্কাস ভিনিসিয়াসের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়! পদানত লিডিয়া দেশের নির্ব্বাসিত একটা নগণ্য মানুষ! রোমের সম্রাটকেও সে গ্রাহ্য করে না? পৃথিবীটা রাতারাতি উল্‌টে গেল? কল্পনার অতীত এমন ব্যাপার কেমন করে সম্ভব হলো? রোমের মধ্যে রোমের সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘিত হয় কেমন করে?

পেত্রোনিয়াস অবাক হলেও বিশেষ বিচলিত হননি। তিনি এ-রকম ব্যাপার আরও দেখেছেন। নারীঘটিত ব্যাপারে যে-কোন অনর্থ যখন-তখন ঘটতে পারে! মার্কাসকে শান্ত করবার চেষ্টা

করেন—কোথায় যাবে ওরা? রোমের সীমানার মধ্যে থাকলে লিজিয়াকে ধরে আনা মোটে শক্ত হবে না। আর যদি বাইরেই যায়, সব জায়গার রাজ্যপালদের কাছে সম্রাটের আদেশ পাঠাবো, লিজিয়াকে খুঁজে বার করবার জন্য। পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা আছে—যেখানে রোমের শাসন চলে না?

ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত মার্কাস বলেন—কোথাও তাদের খুঁজতে হবে না, —ঐ প্লতিয়াসের বাড়ীতেই পাওয়া যাবে। ও লোক কম নয়! উনিই আর্শাস্‌কে দিয়ে লিজিয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন! বুড়োর মতিচ্ছন্ন হয়েছে! এতে যে সম্রাটের বিরুদ্ধে কাজ করা হলো, এ জ্ঞান তার নেই?

—কিন্তু প্লতিয়াসই এ কাজ করেছেন, প্রমাণ করা যাবে না! আপত্তি তুললেন পেত্রোনিয়াস।

—অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কী? আমি সম্রাটের কাছে গিয়ে একদল প্রিটোরিয়ান গার্ড চেয়ে নেবো। তারা তল্লাস করবে প্লতিয়াসের বাড়ী। লিজিয়াকে নিশ্চয় পাওয়া যাবে সেখানে। দৃঢ়-স্বরে বলেন মার্কাস।

পেত্রোনিয়াস বোঝাতে বসলেন মার্কাসকে। মার্কাস যে চালে চলতে চান, সেটা ভুল। তাছাড়া সম্রাট এ কাজের জন্য প্রিটোরিয়ান গার্ড দেবেন না হয়তো! তিনি দিতে চাইলেও সম্রাটের হিতৈষী হিসাবে পেত্রোনিয়াসের কর্তব্য হবে তাঁকে এ-রকম কাজে নিবৃত্ত করা। কারণ, প্লতিয়াস হচ্ছেন সাম্রাজ্যের একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সেনাপতি হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল একদিন।

রোমের প্রাচীন অভিজাত-বংশের লোক তিনি। তাঁকে অপমান—সম্রাটের পক্ষেও নিরাপদ নয়! কারণ অভিজাতেরা সকলে এতে ক্ষেপে উঠতে পারে! এবং তা যদি ওঠে, তাহলে নীরোর সিংহাসন দুলে উঠবে। ভুলে যেয়ো না, নীরোর আগের সম্রাট কলিগুলা ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন!

—কিন্তু আগেও তো একবার প্রিটোরিয়ান গার্ড পাঠানো হয়েছিল ঐ প্লতিয়াসের বাড়ীতে। তখন তো তুমি এ-সব কথা তোলোনি! —অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন মার্কাস।

—কী আশ্চর্য্য! তফাৎটা তুমি বুঝতে পারছো না! তখন গার্ডরা গিয়েছিল এক যুদ্ধবন্দিনীকে সম্রাটের কাছে নিয়ে আসতে। সেটা অনধিকার চর্চ্চা নয়। আইনতঃ সম্রাটের সে অধিকার আছে। কিন্তু এখন তুমি যা করতে চাইছো—এতে আইনের সমর্থন নেই। ধরো, যদি প্লতিয়াসের বাড়ীতে লিজিয়াকে না পাওয়া যায়?

সুদৃঢ় স্বরে মার্কাস বললেন—পাওয়া যাবেই!

মাথা নেড়ে পেত্রোনিয়াস উত্তর দিলেন—আমার বিশ্বাস, ওখানে লিজিয়াকে পাওয়া যাবে না। তার কারণ, ওরাই যদি মেয়েটাকে সরিয়ে থাকে, তাহলে নিজেদের কাছে কখনো তাকে রাখবে না। যা বলছিলাম—লিজিয়াকে যদি ওখানে না পাওয়া যায়, অবস্থা তখন কি দাঁড়াবে? প্লতিয়াস অভিযোগ করবেন যে মিথ্যা এবং হাস্যকর সন্দেহের বশে তাঁর মত সম্ভ্রান্ত পদস্থ রোমান অভিজাতকে অপমান করা সম্রাটের উচিত হয়নি! এ-অভিযোগ যদি ওঠে, নীরো তার কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারবেন না, এবং অভিজাতেরা সকলে

তাঁর উপর ক্ষেপে উঠবেন! আরও বিপদের কথা তোমায় আগেই বলেছি।

—তবে আমায় কী করতে বলো এখন? বিরক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করেন মার্কাস।

পেত্রোনিয়াস বলেন—আমার কথা যদি শোনো, তবে লিজিয়ার চিন্তা ছেড়ে দাও। নিজের জমিদারীতে চলে যাও সিসিলি দ্বীপে। কিংবা আমার সঙ্গে এন্টিয়ামে এসো। কাল সম্রাট সেখানে যাচ্ছেন, আমরা সকলেই সেখানে যাচ্ছি। তুমি যদি যাও, বেশ আনন্দে থাকবে।

—না, তা হতে পারে না। দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন মার্কাস।

—হতে যে পারবে না, তা আমি আগেই জানতাম। কারণ তুমি পাগল হয়েছো। তা বেশ, তা যখন হতে পারে না, তখন কাল সকালে নিজে একবার প্লতিয়াসের ওখানে যাও, একেবারে একা। কথায় কথায় বোঝবার চেষ্টা করবে, ওখানে লিজিয়া আছে কি না। যদি না থাকে, তাহলে মন স্থির করে অন্যত্র তাকে খুঁজতে সুরু করবে।

—আর যদি বুঝি, সে ওখানেই আছে?

—তখন তাকে আবার কেড়ে আনবার অধিকার তোমার অবশ্যই থাকবে!

—কিন্তু এভাবে কেড়ে আনা যায় না! তুমি বলছো—সম্রাট এ-কাজের জন্য আমায় গার্ড সৈন্য দেবেন না!

—না-ই বা দিলেন! সম্রাটের সৈন্য ছাড়া আর কেউ অস্ত্র ধরতে

জানে না ? সোনা ছড়ালে এই রোমেই দশ হাজার বেসরকারী সৈন্য পাওয়া যাবে ! তোমার তো দরকার মোটে দশ জন !

* * * *

সকালেই মার্কাসের রথ চলেছে এপিয়ান ওয়ে দিয়ে। হাল্‌কা রথ হাওয়ায় উড়ে চলেছে যেন ! প্লতিয়াসের দ্বারে এসে রথ থামলো। প্লতিয়াস আর পম্পেনিয়া দু'জনেই ছিলেন গৃহে। মার্কাসকে সদম্ভ পদক্ষেপে ভিতরে আসতে দেখে তাঁরা এগিয়ে এলেন না—সৌজন্য দেখাবার জন্য। এতে মার্কাসের ক্রোধের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লো যেন !

তীক্ষ্ণস্বরে তিনি বললেন—এই ভালো। যারা শত্রুতা করতে চায়, তাদের মৌখিক শিষ্টাচারের কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। তাই বাজে আলাপ-প্রলাপ না করে আমার যা বক্তব্য, বলি। লিজিয়াকে একবার খবর দিন—আমি তাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে পম্পেনিয়া বললেন—লিজিয়াকে খবর দেবো ? এর মানে ? তাকে তো সৈনিকরা সম্রাটের প্রাসাদে নিয়ে গেছে !

চোখে ক্রূর দৃষ্টি—মার্কাস বললেন—চমৎকার অভিনয় ! আপনি তাহলে বলতে চান সৈনিকরা লিজিয়াকে নিয়ে যাবার পর আপনি আর তাকে দেখেননি ?

—নিশ্চয় না ! আমাদের কথায় অবিশ্বাস হয়, সৈন্য এনে বা নিজে বাড়ী তল্লাসী করে দেখতে পারেন !

—তল্লাস করে ফল ! আপনারা তাকে এ-বাড়ীতে না রেখে আর

কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন ! কিন্তু তাকে চুরি করেছেন আপনারাই, এতে কারও কোন সন্দেহ নেই। রক্ষীরা বলেছে—দৈত্যের মত প্রকাণ্ড একটা লোক হঠাৎ কোথা থেকে এসে তাদের মেরে জখম করে লিজিয়াকে কেড়ে নিয়েছে ! এ দৈত্য আপনাদের আর্শাস ছাড়া আর কেউ নয় ! কোথায় সে আর্শাস ? ডাকুন তাকে !

আর্শাস তো লিজিয়ার সঙ্গেই গিয়েছিল।—উত্তর দিলেন পম্পেনিয়া।

ক্রুদ্ধস্বরে মার্কাস এবার বললেন—জবাব খাশা তৈরী করে রেখেছেন দেখছি। তাহলে সেনাপতি প্লতিয়াস, এ ছাড়া আপনার আর কিছু বলবার নেই ?

প্লতিয়াস গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—এ-ছাড়া একটি মাত্র কথা আমার বলবার আছে। সে কথা এই যে আপনাকে যে আতিথ্যের সম্মান দিয়েছিলাম, আপনি তার চমৎকার জবাব দিলেন !

—চমৎকার জবাব ! উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মার্কাস—প্রতিদানের প্রশ্ন নয়। যুদ্ধবন্দীর বা বন্দীর প্রতিভূদের উপর সম্রাটের অধিকার আছে। সেই অধিকারে তিনি এ কাজ করেছেন। এর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ?

প্লতিয়াস বললেন—সম্রাটের অধিকার ! এ অধিকার রক্ষা করবার ফলেই সম্রাট অধঃপাতে যাবেন !

—বেশ, সম্রাটকে আপনার এ কথা আমি জানাবো !

মার্কাস আর দাঁড়ালেন না সেখানে। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে রথ চালিয়ে দিলেন নগরের দিকে। পেত্রোনিয়াস তখন এন্টিয়াম যাত্রার

জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, ভাগিনেয়ের মুখে খবর শুনে বললেন—প্লতিয়াস মিথ্যা বলবেন—এমন ধারণা আমি করতে পারি না। লিজিয়ার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে ওঁদের একটুও যোগ নেই!

—তাহলে আর কোন্ লোক তাকে নিয়ে যেতে পারে?

—কে নিয়ে যেতে পারে বা কে নিয়ে গেছে, তার সন্ধান শক্ত হবে না মার্কাস। চিলো বলে এক গ্রীককে আমি জানি। যত চোর, গুণ্ডা, বদমায়েস আছে রোমে, তাদের সকলকে সে জানে। চল, চিলোর কাছে···সে লোকটা গুণতেও জানে। একটা খবর নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে!

মার্কাস তখনি যাবার জন্যে প্রস্তুত হন।



পাঁচ

রোমের বস্তি অঞ্চলে চিলোর বাস! নোংরা একখানা ঘর, তার দেওয়াল আর ছাদ যেন যুগ-যুগান্তর ধোঁয়ায় কালো হয়ে আছে। সেই ছাদ থেকে একটা বিরাট কুমীর ঝুলছে। কুমীরটা অবশ্য জ্যান্ত নয়; মরা কুমীরের চামড়ার মধ্যে তুলো ঠাশা। এধারে-ওধারে নানা রকম যন্ত্রপাতি, যা গণৎকার বা বাজিকরদের কাজে লাগে।

মার্কাসের গা ঘিন-ঘিন করছে এ ঘরে ঢুকে অবধি। কিন্তু গরজ বড় বালাই! কাজেই ধৈর্য্য ধরে তাঁকে বসে থাকতে হয়েছে এই বুড়ো লোকটার সামনে। বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মার্কাস বুঝলেন, সে কি জাতের লোক। তার মুখের দিকে চাইলেই স্পষ্ট চোখে পড়ে, দুটো চোখে জ্বলছে শৃগালের ধূর্ত্ততা আর রেখায় রেখায় ফুটে আছে খরগোসের ভীরুতা। সবজান্তা,—মুখে যেন খৈ ফুটছে! কোনো কথাতেই সে না বলে না! নিজের তারিফ করতে এতটুকু দ্বিধা নেই। মার্কাসকে দ্বিধা-সংশয়গ্রস্ত দেখে সে নিজেই বলে ওঠে,—ভাবছেন কি মশাই! আপনি ঠিক জায়গাতে এসেছেন …এ সব ব্যাপারে আমার চেয়ে ওয়াকিবহাল সারা রোমে আর পাবেন না। হ্যাঁ, যার জন্যে আপনি এসেছেন, তার আমি সব জানি!

—জানো যদি তবে বলে ফেল! মার্কাস বলেন।

—জানি মানে, কী ভাবে মেয়েটাকে খুঁজে বার করতে হবে, জানি। এই বিরাট সহর রোম। এতে নানা ধর্ম্মের লোকের বাস।

প্রথমে ঠিক করতে হবে, কোন্ ধর্ম্মের লোকের হাতে সে পড়েছে। সেটা ঠিক হয়ে গেলে তাকে পাওয়া সোজা হবে। তার কারণ, কোন্ দলের আড্ডা কোথায়, আমি সব জানি।

—কিন্তু কোন্ দলের হাতে সে পড়েছে, ঠিক করবে কী করে শুনি? অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করলেন মার্কাস।

—তারও উপায় আছে মশাই। প্রত্যেকটি ধর্ম্মের চিহ্ন আছে এক-একটা। কোন-এক-ধর্ম্মের দু'টো লোক দেখা হলে প্রথমেই তারা সে-চিহ্নে ইসারা করে—সেই হলো তাদের সঙ্কেত। বিধর্ম্মী বা সাধারণ মানুষ সে-সঙ্কেতের মানে বোঝে না।

—সঙ্কেত!—মার্কাস বিরক্ত হয়ে বলেন—সঙ্কেত না ছাই আর ভস্ম!

—ঐ ছাই আর ভস্মের ভিতর থেকেই আমি আপনার রত্ন উদ্ধার করে দেবো, দেখুন না! এখন বিবেচনা করুন—মিনার্ভা-দেবীর যারা ভক্ত, তাদের চিহ্ন হলো প্যাঁচা। জুনোর চিহ্ন হলো, ময়ূর। এমনি কত যে আছে, সীমা-সংখ্যা নেই তার। এই যে সেদিনকার ভূঁইফোঁড় খৃষ্টান-ধর্ম্ম, তাদেরও এমনি চিহ্ন আছে এরই মধ্যে—সে চিহ্ন হলো, মাছ।

—মাছ! মার্কাসের মনে পড়লো—মাছের ছবি আঁকা। মনে হতে তাঁর সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জেগে উঠলো।

—হ্যাঁ, মশাই, মাছ! ওদের দেবতা যীশুখৃষ্ট, জানেন তো? যীশুখৃষ্ট, তুমিই ত্রাণকর্ত্তা! এতে যে-কটি শব্দ আছে গ্রীক ভাষায়, তার প্রত্যেকটার প্রথম অক্ষর নিয়ে পর-পর সাজিয়ে গেলে 'ইক্থাস্'

শব্দটি পাওয়া যায়, আমাদের ভাষায় তার মানে, "মাছ"। কাজেই মাছ হয়ে দাঁড়িয়েছে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রতীক-চিহ্ন!

মার্কাস এ-সব কথায় কাণ দিচ্ছিলেন না। তিনি মনে করতে চেষ্টা করছিলেন, কোথায় এই মাছের চিহ্ন দেখেছেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, বলে উঠলেন—মাছ! লিজিয়া একদিন খড়ি দিয়ে মাছ আঁকছিল, দেখেছি!

—দেখেছেন? তাহলে আর কথা নেই! মেয়েটা খৃষ্টান।

খৃষ্টান! লিজিয়া খৃষ্টান? এ যে আর এক অন্তরায়! খৃষ্টানরা যে রোম-সমাজে ঘৃণ্য অপাংক্তেয়! তারা দেবতা মানে না, নাস্তিক! কোথাকার এক ছুতোরের পূজো করে! রোমের পুলিশ তাদের দেখে চোর-ডাকাতের মত সন্দেহের চোখে। এ দলের এক বালিকাকে নিজের জীবনে গেঁথে তাকে জন্ম-সাথী করে নেওয়া—মার্কাসের পদে পদে অসুবিধা হবে তো!

কিন্তু তখনই মনকে বুঝিয়ে ফেললেন মার্কাস। লিজিয়াকে একবার হাতে পেলে তাকে নিয়ে তিনি সিসিলিতে চলে যাবেন—সেখানে রোমের পুলিশের দন্তস্ফুট করবার উপায় নেই! লিজিয়া মার্কাসের কাছে আছে, সে-কথা পৃথিবীর লোক দু'দিনে ভুলে যাবে!

তারপর আর এক ব্যাপার ঘটতে পারে! লিজিয়াকে বুঝিয়ে খৃষ্ট-ধর্ম্মের মোহ থেকে মুক্ত করা হয়তো কঠিন হবে না। তাহলে ভবিষ্যতে ওকে নিয়ে রোমের সমাজে বাস করায় কোন বাধা থাকবে না।

চিন্তার সূত্র ছিন্ন হলো চিলোর কণ্ঠস্বরে। সে বললে—ও যখন

খৃষ্টান, তখন চিন্তা নেই। আমি জানি—খৃষ্টানদের আড্ডা কোথায় কোথায় আছে। সে-সব জায়গায় খবর নিলেই পাত্তা পাবো।

মার্কাস বললেন—খবর নিয়ে সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করো—পেত্রোনিয়াসের বাড়ীতে। এই বলে তিনি উঠলেন।

চিলো সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। হাতে হাত কচলে বললে—আজ্ঞে এর জন্যে কিছু খরচ-পত্র আছে···তার কিছু দিয়ে গেলে ভালো হতো না?

একটা টাকার তোড়া চিলোর দিকে ছুড়ে মার্কাস রুক্ষস্বরে বললেন—টাকা নাও, কিন্তু কাজ উদ্ধার করা চাই। নাহলে আর এক রকম বকশিষ মিলবে—চাবুক!

* * * *

সেই সন্ধ্যাতেই চিলো এসে দেখা করলো। মুখে-চোখে উত্তেজনা। মার্কাসের দু-চোখে প্রশ্ন—মার্কাস নির্ব্বাক, চিলো বললে—পেয়েছি, মশাই, পেয়েছি! সন্ধান পেয়েছি!

—কোথায়? কোথায় সে? লাফিয়ে উঠলেন যেন মার্কাস!

—তা এখনও জানতে পারিনি!

—তবে কি সন্ধান পেয়েছো? তামাসা! বেয়াদবি! তর্জ্জন করে উঠলেন মার্কাস।

—আহা, রাগ করছেন কেন মশাই? আমি কি আপনার সঙ্গে তামাসা করতে পারি? আপনার সঙ্গে আমার কি তামাসার সম্পর্ক! তা নয়! মানে, কোথায় সে থাকে, সে সন্ধান এখনও পাইনি বটে,

তবে এই রাত্রে কোথায় গেলে তাকে দেখতে পাওয়া যাবে, তা জানতে পেরেছি।

—তাই বলো! কোথায় যেতে হবে ?

—রোমের বাইরে। এক জায়গায় কতকগুলো ছোট ছোট পাহাড় আছে, নোমেন্তান গেটের ওধারে। সেই পাহাড়ের গুহায় আজ রাত্রে খৃষ্টানদের এক জমায়েত বৈঠক বসবে। রোমের যত খৃষ্টান, ছেলেবুড়ো মেয়ে-পুরুষ, সবাই সেখানে যাবে। তাদের কোন্ পয়গম্বর না কি খুব বক্তৃতা করবে সে বৈঠকে!

—লিজিয়াও যাবে? জিজ্ঞাসা করলেন মার্কাস। তাঁর স্বরে সংশয়।

—আলবৎ যাবে! সে যখন মাছ এঁকেছিল, তখন অবশ্যই সে যাবে। এমন খৃষ্টান এদেশে কেউ নেই, যে যাবে না! আপনি সন্ধ্যাবেলায় সেখানে যান। নোমেন্তান গেট চেনেন নিশ্চয় ?

—চিনি বই কি! কিন্তু আমি একা যাবো, ভেবেছো ?

—তবে আর কে যাবে? আমি? ওরে বাপ্‌রে! আমার ভয় করে। স্পষ্ট বলছি মশাই, আমার সাহস একটু কম। অন্ধকারে আমার ভয় করে। অনেক অচেনা লোক এক জায়গায় দেখলে আমার হাত-পা কাঁপতে থাকে! বিশেষ, অচেনা লোকরা যদি খৃষ্টান হয়, আমি তাদের ছায়া মাড়াই না। দেশের লোক যে ওদের নাম শুনলে ক্ষেপে ওঠে, সেটা অকারণে নয়, মশাই! ওরা অতি পাজি লোক! ভয়ানক বেপরোয়া! গ্লকাস বলে এক খৃষ্টান ডাক্তারের অসুখের সময় —কী সেবাই না করেছিলাম তার! সেরে উঠে সে বলে কিনা আমি

তার সর্ব্বনাশ করেছি! তার স্ত্রী-পুত্রকে আমি নাকি চুরি করে বেচে দিয়েছি! এই সব অকথ্য কথা, মশাই! আমি হাড়ে হাড়ে চিনি ঐ খৃষ্টানদের। ওদের ত্রিসীমা আমি মাড়াই না।

—যেতে তোমাকে হবেই। না গেলে আর একটি পয়সা পাবে না আমার কাছ থেকে! এই বলে আর এক তোড়া টাকা বার করে চিলোর সম্মুখে নাচাতে লাগলেন মার্কাস।

হাত বাড়িয়ে তোড়াটা নিয়ে চিলো নিশ্বাস ফেললো, বললে—তাহলে যেতেই হবে! কিন্তু ভেবে দেখুন মশাই, ওরা অতি পাষণ্ড! যাকে বলে, মরিয়া! নিশুতি রাতে নির্জ্জন পাহাড়ে ওরা হাজারে হাজারে জমায়েত হবে। সেখানে আপনার একা যাওয়া কি নিরাপদ হবে? ওরা আপনাকে চিনতে পারলে প্রাণ নিয়ে আপনাকে ফিরে আসতে হবে না! ওদের দলের লিজিয়াকে আপনি একবার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, আবার ছিনিয়ে নিতে চান, আপনাকে ওখানে দেখলেই ওরা তা বুঝবে। তখন? আপনি যত-বড় বীর হন, একা কখনো হাজার লোকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন? যাবেন না ওখানে।

সুদৃঢ় কণ্ঠে মার্কাস বললেন—যাবো আমি নিশ্চয়, এবং আমি একা যাবো না, তুমিও যাবে। বিপদ যদি ঘটে, তোমায় দিয়ে কোনো সাহায্য হবে না, জানি। তার জন্যে আমি সঙ্গে নেবো ক্রোটোনকে।

—ক্রোটোন? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলো চিলো!—রোমের সেরা কুস্তিগীর?

—হ্যাঁ, সেই ক্রোটোন! যত টাকাই সে নিক্, তাই দিয়ে

আজকের রাত্রির জন্যে তাকে নেবো। সে সঙ্গে থাকলে তোমার ওখানে যেতে আপত্তি নেই তো ?

—আপত্তি আবার নেই ? হ্যাঁ, তবে টাকার তোড়া যখন পকেটে পূরেছি, তখন যেতেই হবে আমাকে ! তা ক্রোটোন সঙ্গে যাক আর না যাক !

পালোয়ান ক্রোটোন আর ভীতু চিলোকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার পরই মার্কাস বেরিয়ে পড়লেন নোমেন্তান গেটের উদ্দেশে। সহর থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই ছোট ছোট পাহাড়—তার মাঝে মাঝে বালির খদ আর পাথর-খোঁড়া গহ্বর। এখন সেখানে আর বালি বা পাথর তোলা হয় না। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জনমানবের এখন আর যাতায়াত নেই।

মার্কাস আর তাঁর সঙ্গীদের বেশভূষা গ্রামের লোকের মত আঙ্গরাখা, মাথায় কাণ-ঢাকা টুপি, তাতে মুখের খানিকটা ঢাকা পড়েছে। হাতে লণ্ঠন আছে, কিন্তু তার তিনদিক ঢাকা, যাতে কারো নজরে না পড়ে ! কটিতে ছোট বাঁকা ছোরা আত্মরক্ষার জন্যে। চিলো ভয়ে কাঁপছে, সহর ছেড়ে পাহাড়ের পথে এসে তার পা আর চলতে চায় না যেন !

বাঁ দিকে সারি সারি বালির খদ। কোথাও প্রাচীন যুগের পরিত্যক্ত সমাধিক্ষেত্র। অন্ধকার হয়ে গেছে,—পথ চিনে যাওয়া কঠিন হলো। ভালো করে লক্ষ্য করবার পর চোখে পড়ে আব্ছা কতকগুলি মূর্ত্তি। অনেকের হাতে ঢাকা-লণ্ঠন। পথে পুলিশ, তারা এ-সব ছায়ামূর্ত্তি দেখেছে, কিন্তু খৃষ্টান বলে সন্দেহ হয়নি। হয়তো রাতের

মজুর, নয়তো কবর-খোঁড়ার লোক। তারা রাত্রির অন্ধকারে এই-সব জায়গায় এসে নানা অনুষ্ঠান করে, ভূত-প্রেত পিশাচদের খুশী রাখবার জন্যে।

পুলিশ ওদের চিনতে পারেনি, কিন্তু মার্কাস পেরেছেন। ওরা খৃষ্টান। কেউ কেউ মৃদু গুঞ্জনে গান গাইছে। সে গানের ধুয়া—হে ঘুমন্ত দেবতা, তুমি জাগো! মরণের গুহা থেকে আবার তুমি ওঠো!

মার্কাস এ-সব লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মন সেদিকে ছিল না। তাঁর শুধু এক ধ্যান!—লিজিয়া? অন্ধকারে দলে-দলে আব্‌ছা মূর্ত্তি বালির খদের পাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চলেছে। ওরই কোনো এক দলে লিজিয়া আছে নিশ্চয়! এ অন্ধকারে তাকে চিনে বার করা যাবে কি করে?

চিনতে পারলে লিজিয়ার নিস্তার নেই! মার্কাস তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পালাবেন। যারা বাধা দিতে আসবে, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে পালোয়ান ক্রোটোন। ক্রোটোন সভ্য-জগতের সেরা পালোয়ান—তার হাতে কারও পরিত্রাণ নেই! এমন কি সেই দৈত্য আর্শাস যদি আসে, ক্রোটোনের হাতে তাকেও ঘায়েল হতে হবে নিশ্চিত!

অচেনা খৃষ্টান-রমণীদের অনুচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর ভুল হয়, ঐ বুঝি লিজিয়া! অমনি বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে। তিনি দু-পা এগিয়ে যান—তার পরই বুঝতে পারেন,—ভুল! হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে অমনি পেছিয়ে পড়েন, ক্রোটোন আর চিলোর সঙ্গে ধীরে ধীরে সাবধানে হাঁটতে থাকেন আবার।

পথ যেন আর ফুরোতে চায় না! এ অঞ্চল তাঁর অপরিচিত নয়। কিন্তু এই অন্ধকারে কিছুই তিনি ঠিক ঠাহর করতে পারেন না। এখানে এই সরু গলিটা এলো কোথা থেকে? ওখানে এ-রকম কোনো দেয়াল তো ছিল না! একটা গুহা নাকি? এদিকে এরকম কোনো গুহা ছিল বলে তাঁর মনে পড়ে না!

অবশেষে সঙ্কীর্ণ একটা গিরি-পথ দিয়ে তাঁরা এক পরিত্যক্ত গহ্বরের ভিতরে এসে পড়লেন। পাথর খুঁড়ে জায়গাটাকে এমন করে রেখে গিয়েছে যে তার নীচে দাঁড়ালে চারিদিককার পাহাড়কে মনে হবে সার্কাসের গ্যালারি—রোমে যে ধরণের গ্যালারির লোকে নাম দিয়েছিল আম্ফি-থিয়েটার। বহু খৃষ্টান সেই গ্যালারির মতো পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাথরের উপর বসে আছে। নানা শ্রেণীর লোক নীরবে জমায়েত হয়েছে এখানে।

এ গহ্বরের মাঝখানে খানিকটা জায়গা ঘেরা আর একপ্রান্তে প্রকাণ্ড উঁচু একখানা পাথর। মনে হয়, এই পাথরের উপর দাঁড়িয়েই প্রচারকরা বক্তৃতা করবেন। ঘেরা জায়গাতে জানু পেতে বসে আছে অনেক লোক, তাদের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক দীর্ঘদেহ পুরুষ! আশে-পাশে মশাল জ্বলছে—আর বড় পাথরখানার ঠিক নীচে নতজানু লোকগুলির সামনে দীর্ঘ একখানি ক্রশ-কাষ্ঠ।

চিলো ফিস্-ফিস্ করে মার্কাসকে বলে,—ঐ হলো পল! ওদের সবচেয়ে বড় নেতা—খৃষ্টানরা বলে, আচার্য্য পল।

মার্কাসের মনে পড়লো, প্লতিয়াসের গৃহে তিনি যেদিন অতিথি হয়েছিলেন, সেদিন এই লোকটিকে সেখানে দেখা গিয়েছিল একবার।

প্লতিয়াস আর পম্পেনিয়ার খুব অন্তরঙ্গ বলেই মনে হয়েছিল ওকে। কিন্তু ওর চাষার মত বেশভূষা দেখে মার্কাস ঘৃণায় ওর সঙ্গে বাক্যালাপ করেননি !

পলের পিছনে বারো বছর বয়সের একটি ছেলে। চিলো বললে তার নাম নাজারিয়াস্। একটি পাত্র হাতে—সে পলের সঙ্গে ঘুরছে, তাই থেকে জল নিয়ে পল প্রত্যেকটি নতজানু লোকের মাথায় ছিটিয়ে দিচ্ছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়, প্রাণস্পর্শী কণ্ঠে বলে উঠছেন—পিতা, পুত্র আর পবিত্র আত্মা—ঈশ্বরের এই ত্রিমূর্ত্তির নামে আমি তোমাকে দীক্ষিত করছি।

চিলো ফিস্-ফিস্ করে বলে—এই হলো ওদের খৃষ্টধর্ম্মের দীক্ষা ! খানিকটা নোংরা জল মাথায় ছিটিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু আমাকে আর কি দরকার ? আমার কাজ তো শেষ হয়েছে ! এইখানে সে আছে নিশ্চয়। আপনি আমার টাকা দিয়ে দিন, আমি চলে যাই।

মার্কাস বললেন—তা কি হয় ? তোমার যাওয়া হবে না। তারপর ক্রোটোনের দিকে ফিরে তিনি আদেশ করলেন—ঐদিকে গিয়ে দাঁড়াই চলো, ওখান দিয়েই ফিরে যাবে সবাই—যাওয়ার সময় প্রত্যেকের মুখ দেখতে পাওয়া দরকার।

দীক্ষা-দান সমাপ্ত করে পল সকলকে শুনিয়ে বলতে লাগলেন—আমি জানি, এখানে এমন অনেকে আছেন, যাঁদের মনের সন্দেহ এখনো ঘোচেনি, যাঁরা এখনো দীক্ষা গ্রহণ করেননি। আমি জানি, এ সন্দেহ প্রত্যেক মানুষের মনে থাকে। থাকা

একটুও অস্বাভাবিক নয়। প্রভু যীশুও তা জানতেন। তাই প্রত্যেককেই তিনি প্রশ্নের অধিকার দিতেন। যে-কেউ তাঁর সামনে এসে যে-কোন প্রশ্ন করতে পারতো—প্রভু সযত্নে সে-সব প্রশ্নের এমন উত্তর দিতেন, যাতে সন্দিগ্ধ ব্যক্তির দ্বিধার অবসান হতো। তাঁর এই রকম বহু উত্তর যিনি স্বকর্ণে শোনবার সুযোগ পেয়েছিলেন একদিন, এমনি এক মহাপুরুষ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। ইনি যীশুর মুখ স্বচক্ষে দেখেছেন, নিজের হাতে ইনি যীশুর পাদপদ্ম স্পর্শ করেছেন! জেরুসালেম থেকে ইনি এসেছেন। একদিন ইনি সামান্য জেলের কাজ করতেন। আগে এঁর নাম ছিল সাইমন। এখন এঁর নাম পিটার।

পিটার ততক্ষণে পিছনের মাটির সিঁড়ি দিয়ে বড় পাথরখানার উপর উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দিকে হাত নেড়ে পল সানন্দে বললেন—ইনিই!

মহিমময় তাঁর মূর্ত্তি! কিন্তু তাঁর বাক্য শিশুর মত সরল। প্রশান্ত হাস্যে জনতাকে আপ্যায়িত করে তিনি বললেন—অযোগ্য এই ভৃত্যকে একদা যীশু বলেছিলেন—তুমি পিটার, তুমি সেই শাশ্বত শিলা, যার উপর আমি আমার ধর্ম্ম-মহামণ্ডল গড়ে তুলবো। সেই প্রভু যীশুই রোমের দিকে আমায় আকর্ষণ করেছেন, ভাটিকান পাহাড়ের শীর্ষে তাঁর মন্দির গঠনের কাজে নিযুক্ত করবার জন্যে। তোমরা কেউ তাঁকে দেখনি, তবু তাঁর উপর তোমাদের বিশ্বাস। তার কারণ, তাঁর কণ্ঠ তোমরা শুনেছো তোমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে রাগিণী-ঝংকারের মত।

—আমি তাঁর স্বর প্রথম শুনি গালিলির সমুদ্রের ধারে—আমরা

ক-ভাই ছিলাম জেলে। সারা রাত আমরা জাল ফেলে ফেলে ক্লান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু একটি মাছও ধরতে পারিনি। ভয়ানক শীত করছিল আমাদের, ভয়ানক শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরা।

—আমাদের নৌকা যখন কূলের নিকটবর্ত্তী হয়েছে, তখন আমি শুনলাম, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি চোখ তুলে চাইলাম। দেখলাম, তীরে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। অপরূপ মানুষ! তাঁকে দেখবামাত্রই শীত আর শ্রান্তি ভুলে গেলাম আমি। হৃদয় হয়ে উঠলো আনন্দে ভরপূর।

—আমি উত্তর দিলাম, বন্ধু, এই যে আমি! তিনি ডেকে বললেন —আমি তোমাদের নৌকায় উঠে ওখানে বসে এই লোকগুলির সঙ্গে কথা কইতে চাই। আমরা তাঁকে উঠে আসতে বললাম। উঠে এসে তিনি স্বর্গরাজ্যের কথা বলতে লাগলেন। শুনতে শুনতে আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে উঠলো। কে যেন আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে চেঁচিয়ে বললো—ইনিই খৃষ্ট! ইনিই ত্রাণ-কর্ত্তা!

—যখন তাঁর বক্তৃতা শেষ হলো, আমাকে তিনি বললেন—নৌকা নিয়ে গভীর জলে চলে যাও। সেখানে গিয়ে জাল ফেল আবার। তাই করলাম আমরা। দেখতে দেখতে জাল ভরে গেল মাছে, সে যেন এক ইন্দ্রজাল! আমার বিস্ময় দেখে তিনি বললেন—ভয় পাচ্ছো? ভয় পেয়ো না। মাছের জন্যে জাল ফেলা তোমার এই শেষ! এখন থেকে তুমি জাল ফেলে বেড়াবে মানুষ ধরবার জন্যে। তিনি আমাকে বললেন তাঁর অনুগামী হতে। বিনাবাক্যব্যয়ে আমি চললাম তাঁর সঙ্গে। আমার দুই ভাই জেমস্ আর জনও চললো আমার সঙ্গে।

—সারা দেশের লোককে আমরা ডেকে বেড়ালাম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। ক্রমশঃ একজন, দুজন করে লোক বাড়তে লাগলো। তাঁকে ছাড়া আমাদের সংখ্যা হলো বারো জন। যারা ক্ষুধার্ত্ত, তাদের অন্ন-পানীয় দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। যারা রুগ্ণ, অবসন্ন, শীর্ণ, তাদের জন্যে ছিল তাঁর আশার বাণী আর শান্তির আশ্বাস। ঈশ্বরের পুত্র ভিন্ন কে সেই অমূল্য নিধি বিতরণ করবে? বেথানীর লাজারাসকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। মেরী মডলেনের অন্তরে শান্তির অমৃত সিঞ্চন করার শক্তি একমাত্র তাঁরই ছিল!

—তবু—তবু—আমার সেই ঈশ্বরের পুত্রকে আমি অস্বীকার করেছিলাম! অস্বীকার যে করবো, সে ভবিষ্যদ্বাণীও তিনি করেছিলেন! শেষবার যখন তাঁর সঙ্গে বসে আহার করি, তখন কথায় কথায় আমি বলেছিলাম—হে প্রভু, আমি তোমার সঙ্গে কারাগারে যেতে প্রস্তুত আছি, এমন কি মৃত্যু বরণ করতেও ভয় পাবো না। তখন তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—পিটার, আজ রাত্রেই ভোরের মোরগ ডাকবার আগেই আমার পরিচয় পর্য্যন্ত তুমি তিনবার অস্বীকার করবে!

—ঠিক তাই হলো। যারা তাঁর বিচার করতে বসেছিল, তারা আমাকে বার-বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—তাঁর সম্বন্ধে আমি কী জানি? আমি বার-বার তিনবার উত্তর দিলাম—ও-লোকটিকে আমি চিনি না। মৃত্যুভয়ে এতই আমি কাতর হয়েছিলাম, যে অনন্ত জীবনের উৎস সেই মানব-পুত্রকে আমি অস্বীকার করলাম!

—তারপর তারা তাঁকে ক্রশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ করে টাঙ্গিয়ে দিলে। তাঁর মাথায় তুলে দিলে কাঁটার মুকুট!

—অসীম যাতনার মধ্যেও যীশু কাতরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন তাদেরই কল্যাণের জন্যে—যারা তাঁকে অকথ্য নির্য্যাতনের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলো—পিতা, এদের তুমি ক্ষমা করো! এরা জানে না এরা কী করছে। তিনি ছাড়া আর কেউ এতখানি ক্ষমা করতে পারতো না। তিনি আমাকে ক্ষমা করেছিলেন আমার পাপের জন্যে, তাদেরও ক্ষমা করেছিলেন তাদের অপরাধের জন্যে।

—কিন্তু যিনি মৃতকে পুনর্জীবিত করেছিলেন, তাঁকে মৃত্যু কখনো পরাজিত করতে পারে? তাঁকে সমাধিস্থ করে আমরা যখন ঘরে ফিরে এলাম, বিষণ্ণ অন্তরে অশ্রু বিসর্জ্জন করছি তাঁকে স্মরণ করে, তখন অকস্মাৎ সেই আঁধার ঘরে জ্বলে উঠলো এক দীপ্ত শিখা। পুনর্জীবিত প্রভুকে আমরা দেখতে পেলাম সেই আলোক-শিখার মধ্যে···জ্যোতির্ম্ময় দিব্য মূর্ত্তি!

—আমরা তাঁর হাত দুখানি দেখলাম, যাতে ওরা পেরেক বিঁধিয়ে দিয়েছিল! আমরা তাঁর বক্ষ দেখলাম—সেখানে ক্ষতমুখ থেকে তখনো রক্ত ঝরছে! তিনিই আমাদের প্রভু, তাতে আর সন্দেহ রইলো না! তাঁর স্বরও আমরা শুনতে পেলাম। সব বেদনা ভুলে তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন,—তোমরা শান্তি লাভ করো।

তারপর তিনি আমাদের আদেশ করলেন—সারা পৃথিবীতে তাঁর এই বাণী প্রচার করতে—

যারা অন্তরে নম্র, তারাই ধন্য! স্বর্গরাজ্যের অধিকারী তারাই

যারা অনুতপ্ত, তারাই ধন্য! তারাই পাবে সান্ত্বনা।

যারা নিরীহ, তারাই ধন্য! তারাই পাবে পৃথিবীর আধিপত্য।

যারা ক্ষুধার্ত্ত, তৃষিত, তারাই ধন্য! আমি নিজে তাদের করবো তৃপ্ত।

যারা দয়ালু, তারাই ধন্য! তারাই করবে ঈশ্বরের কৃপা লাভ।

যারা অন্তরে পবিত্র, তারাই ধন্য! তারাই দর্শন করবে ভগবানকে।

যারা শান্তির দূত, তারাই ধন্য! তাদেরই নাম হবে ঈশ্বরের সন্তান।

জীবনে যীশু বহু যাতনা পেয়েছিলেন—মৃত্যু বরণ করেছিলেন অসীম যাতনায়! তাঁর শিষ্য ভক্তরাও জীবনে যাতনা পাবে। হয়তো তাদেরও মৃত্যুবরণ করতে হবে হাজারে হাজারে! কিন্তু তাতে ভয় পেলে চলবে না। কারণ তাদের রক্ত থেকেই পৃথিবীতে আসবে শান্তি।

যে তোমার ডান গালে চড় মারবে, তার দিকে ফিরিয়ে দেবে তোমার বাঁ গাল। প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালোবাসবে। নিজে যে-ব্যবহার পেতে চাও, অন্যের প্রতি সেই ব্যবহারই করবে। শত্রুকে ভালোবাসবে। যে অভিশাপ দেবে, তাকে প্রতিদানে দেবে আশীর্ব্বাদ। যে হিংসা করবে, তার করবে উপকার। যে অত্যাচার করবে, তার জন্যে করবে প্রার্থনা।

তারপর পিটার দুই-বাহু তুলে শঙ্খধ্বনির মত গভীর কণ্ঠে বললেন

—বিশ্বাস রাখবে একমাত্র তাঁর উপর! তাঁর নামে সকল কলঙ্ক সহ্য করবে। তাহলেই অনন্ত-কাল শান্তির অধিকারী হবে! আমেন!

সেই শুভ মুহূর্ত্ত—সেই পরিত্যক্ত পাথর-খোঁড়া গর্ত্তের ভিতরে বসে যে সব নর-নারী পিটারের বাণী শুনছিল, রোমের অস্তিত্বের কথা তাদের মনে ছিল না! মনে ছিল না অমিত-প্রতাপ সীজারের বিদ্বেষের কথা! নগরে পল্লীতে হাজার দেবতার লক্ষ মন্দির মাথা উঁচু করে রয়েছে, কিন্তু তাদের কথা বিস্মৃত হয়ে গেল সেই সব যীশুর পূজারী! তাদের কেবল একটা কথা মনে ছিল তখন! সে কথা—জগতে একমাত্র সত্য হচ্ছেন যীশু—জল, স্থল পরিব্যাপ্ত করে আছেন শত-সূর্য্য-দ্যুতি একমাত্র দেবতা যীশুখৃষ্ট!



ছয়

মার্কাস···রোম মহানগরীর অভিজাত-বংশের শিরোমণি, চির-সম্রাজ্ঞী রোমের বিজয়ী সেনাপতি, শত-যুদ্ধে অকুণ্ঠ-চিত্ত বীর মার্কাস ···একি আজ হলো তোমার ? কি শুনছো এত তন্ময় হয়ে ?

হঠাৎ চিলো ফিস্ ফিস্ করে কী যেন বললো, মার্কাস শুনতে পেলো না, উত্তর দিলো না !—সেদিন সেই ভূগর্ভ-গৃহে, মশালের স্তিমিত আলোয় সামান্য একজন জেলের কথা শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতে কখন একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন মার্কাস ! যখন চমক ভাঙ্গলো, লজ্জিত হলেন। সেই দীর্ঘদেহ বৃদ্ধের শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠস্বরের মধ্যে, তার প্রত্যেকটি কথার মধ্যে এমন সম্মোহন ছিল, যা অতর্কিতে মার্কাসের মনকে একান্ত অভিভূত করে ফেললো ! চমক ভাঙ্গতে মনে হলো, কী করতে সেখানে এসেছেন ! চোখের দৃষ্টি চারিদিকে অন্ধকারে সঞ্চালিত করে তিনি দেখেন—জনতা একে একে চলে যাচ্ছে। তাঁরই কাছ দিয়ে এক একজন বেরিয়ে যাচ্ছে সেই পাহাড়ঘেরা গর্ত্তের ভিতর দিয়ে।

যতখানি সম্ভব মুখ বাড়িয়ে তিনি প্রত্যেককে লক্ষ্য করে দেখছেন। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ নজরে পড়লো দৈত্যের মত এক পুরুষ—তার সঙ্গে সেই বারো বছরের বালক নাজারিয়াস, তার মা মিরিয়াম আর অবগুণ্ঠিতা এক নারী। নারী যে লিজিয়া, আর ঐ দৈত্য যে আর্শাস, তাতে মার্কাসের কোনো সন্দেহ রইলো না !

ওরা এগিয়ে গেল একে একে। পিছনে চললেন মার্কাস তাঁর

সঙ্গীদের নিয়ে। পাহাড়ের মধ্যে কিছু করা সম্ভব হলো না। খৃষ্টানদের এই ভিড়! একটা চীৎকার তুললে সকলে ফিরে দেখবে!…অপেক্ষা করতে হবে। পথে বহু নির্জ্জন যায়গা আছে—চিন্তা কি?

গেট পার হয়ে বড় রাস্তা—তারপর ছোট গলি। গলির পর গলি …আরো সরু, আরো সরু। রোমের দরিদ্র পল্লী। খৃষ্টানরা থাকে এখানে। একটা মোড়ের কাছে এলেন মার্কাস। আর্শাসের দল ছাড়া এখানে আর অন্য লোক নেই।

গভীর রাত্রি। সারা পল্লী নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন। গুণ্ডার সাহায্যে নারী-হরণ যদি করতে হয়, তার ঠিক সময় ঠিক জায়গা এই! আর্শাসের দল একটা বাড়ীর দরজার সামনে থামলো। ভিতরের লোককে ওরা ডাকছে ঐ! এখনই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যাবে। তার আগেই ধরা চাই। মার্কাসের দল এগিয়ে চললো ওদের দিকে।

আর্শাস ফিরে দাঁড়ালো লিজিয়াকে আড়াল করে।—এ লোকগুলি আমাদের পিছু নিয়েছে অনেক দূর থেকে। আমি এদের রুখছি। তোমরা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ো।

বলতে বলতে মার্কাসরা এসে পড়লেন। মার্কাসকে দেখেই চিনলো আর্শাস। হেঁকে উঠলো—এদিকে আর এক-পা এগিয়েছো কি —সাবধান!

মার্কাস থমকে দাঁড়ালেন; আর সেই মুহূর্ত্তে তাঁর পাশ থেকে ক্রোটোন ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়লো আর্শাসের উপর।

ওদিকে ভিতরের লোকেরা বাড়ীর দরজা খুলে দিয়েছে। লিজিয়ারা দ্রুত প্রবেশ করেছে সেই দ্বার-পথে। ক্রোটোনের

অতর্কিত আক্রমণে আর্শাস টাল খেয়ে পড়ে গিয়েছে লিজিয়ার পিছনে —আর সেই অবসরে পাশ কাটিয়ে মার্কাস লিজিয়ার পিছনে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছেন।

চিলো ভীতু মানুষ। তাকে কেউ কিছু করেনি—গোলমালের সুরুতেই সে ছুটে পালিয়েছে। মার্কাসের কাছ থেকে বখশিসের বাকী টাকা তখনো আদায় হয়নি, কিন্তু তার আশায় এখানে থাকলে প্রাণটা কোনো গতিকে রক্ষা পেলেও দেহখানা অটুট রাখা যাবে না—অতএব পলায়নই শ্রেয়ঃ!

ক্রোটোন ওস্তাদ পালোয়ান—কত প্যাঁচ, কত কশরৎ-কৌশল জানে —কুস্তির নানা তাগবাগ নিত্য দিনের অভ্যাসে রপ্ত করেছে। আর্শাস রোমান কুস্তীগিরদের এই সব প্যাঁচ জানে না। তা না জানলেও তার দেহে যা শক্তি—সে শক্তির সামনে ক্রোটোন দাঁড়াতে পারে না। তার উপর আর্শাস তাদের দেশের কুস্তির সব কৌশলই জানে। কাজেই দুজনের লড়াই চলেছে সমানে—কত ওলোট-পালোট···কত ধস্তাধস্তি। শেষে আর্শাস এমন বাগিয়ে ধরলো ক্রোটোনকে যে সে আর নড়তে পারলো না—আর্শাস তাকে ধরে উঁচু করে আকাশের দিকে দিলে ছুড়ে! দড়াম করে ক্রোটোন যখন মাটীতে পড়লো, তখন তার ঘাড়খানা গেল সশব্দে ভেঙ্গে—হাড়গোড় একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ!

গলির একটু দূরে একটা খাল—তাতে বেশী জল নেই, কিন্তু স্রোত খুব প্রখর। ক্রোটোনের দেহখানা আর্শাস তুলে সেই ছোট নদীতে দিলে ফেলে। স্রোতে ভাসতে ভাসতে ক্রোটোনের দেহ চললো নদীতে। এ দেহ গিয়ে পড়বে স্রোতের বেগে সমুদ্রে। কেউ জানবে

না, রোমের সেরা পালোয়ান ক্রোটোনের কি হলো! কোথায় সে উবে গেল!

কিন্তু আর্শাসের অপেক্ষা করা চলে না। সে বাড়ীতে ঢুকলো মার্কাসের সন্ধানে। মার্কাস তখনো এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরছেন লিজিয়ার সন্ধানে। একবার তাকে পেলে হয়! তিনি নিশ্চিত, আর্শাস এতক্ষণে সাফ হয়েছে নিশ্চয় ক্রোটোনের হাতে! লিজিয়াকে কে রক্ষা করবে?

অকস্মাৎ আর্শাস এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো। তিনি চমকে কোমর থেকে টেনে বার করলেন তাঁর বাঁকা ছোরা। কিন্তু আর্শাস ছোরাশুদ্ধ তাঁর হাত এমন জোরে মুচ্‌ড়ে ধরলো যে ছোরাখানা ছিটকে হাত থেকে পড়ে গেল। মার্কাস প্রাণপণ শক্তিতে আর্শাসের টুঁটি চেপে ধরলেন অন্য হাতে। পরক্ষণেই এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে উল্‌টে তিনি পড়ে গেলেন ঘরের এক কোণে। কী একটা আসবাবের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাথায় লাগলো প্রচণ্ড আঘাত! মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো। তখুনি মার্কাস অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

যখন জ্ঞান হলো, তখন সারা দেহে ভয়ানক যাতনা। অতি-কষ্টে তিনি একটু পাশ ফিরলেন। তারপর চোখ খুলে চেয়ে দেখেন—যা কখনো ভাবতে পারেননি—লিজিয়া তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে···তার হাতে জলের গামলা। সেই জলে স্পঞ্জ ভিজিয়ে তাঁর মাথার ক্ষত ধুইয়ে দিচ্ছে আর একটি রমণী।

আর্শাস তাঁর গায়ের জামা খুলে দিয়েছে। কোমর পর্য্যন্ত খোলা। মার্কাসের দিকে তাকিয়ে নাজারিয়াস হঠাৎ চমকে উঠলো। মার্কাসের

বগলের নীচে একটা চওড়া ক্ষত! দেখে আর্শাসকে সে জিজ্ঞাসা করলো—ওটাও তুমি করেছো?

উত্তর দিলে লিজিয়া—না, নাজারিয়াস! দেখছো না, পুরোনো ঘা। হয়তো যুদ্ধে চোট লেগেছিল কোনো সময়।

নাজারিয়াস উৎসাহিত হয়ে বলে—নিশ্চয় তাই। উনি সীজারের খুব বড় সেনাপতি তো।

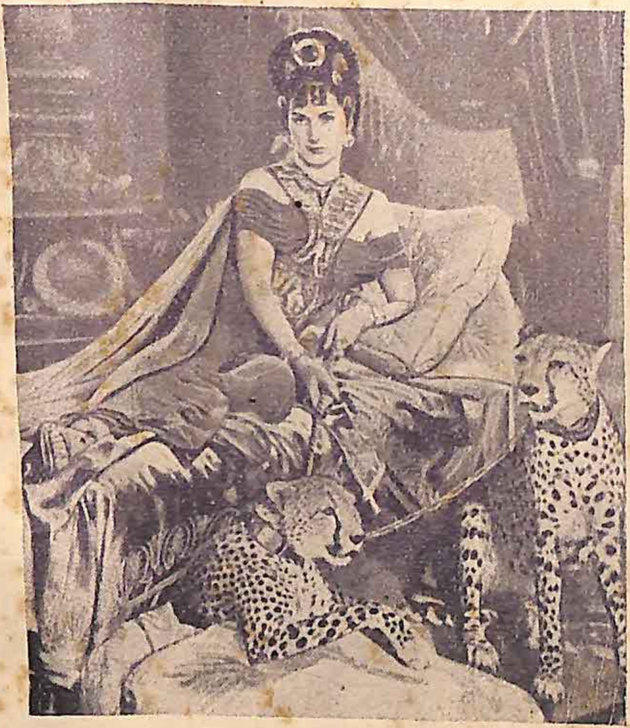
মা মিরিয়াম তাকে আর সেখানে থাকতে দিলে না—রাত অনেক হয়েছে। ঘুমোবে চলো, নাজারিয়াস!—এই বলে সে পুত্রকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্পঞ্জ তুলে নিয়ে মার্কাসের মাথার ক্ষত পরিষ্কার করতে লাগলো লিজিয়া। মার্কাসের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার অধর স্ফুরিত হলো, দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো তার চোখ থেকে। মার্কাস তখন আবার চোখ বুজেছেন। তাঁর নিশ্বাস পড়ছে ধীরে ধীরে কিন্তু নিয়মিত ভাবে। দেহের চাদরের আবরণটা টেনে দিয়ে লিজিয়া মন্থর পায়ে সেখান থেকে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে মার্কাস আবার পাশ ফিরে চোখ মেলে চাইলে। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ধীরে ধীরে উঠে বসে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। অতি-সতর্কে দেখতে লাগলেন নিজের মাথা। তিনি কোথায়, মনে করতে পারছেন না যেন! জামার অঙ্গরাখার রক্তের দাগ তুলে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। সেগুলো শুকিয়ে কে ঐ চেয়ারে রেখে গিয়েছে। মার্কাস উঠে দাঁড়ালেন—দাঁড়িয়ে নিজের



মার্কাসকে সৈনিকদের সাহায্যে বন্দী



মহিষী পপিয়া দুটো চিতা-বাঘ নিয়ে

[ছবি—মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারের সৌজন্যে

পোষাক পরতে লাগলেন। কষ্ট হচ্ছে খুব—তখনো সারা শরীরে বেদনা।

জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। নীচের উঠানে কথা কইছে লিজিয়া আর আর্শাস। তারা মুখ তুলে চাইলো তাঁর দিকে। তবু মার্কাস ঠিক মনে করতে পারছেন না, এ তিনি কোথায় এসেছেন! কেমন করে এসেছেন এখানে! আনমনার মত আবার ঘরে ফিরে এলেন। পোষাক পরার যেটুকু বাকী ছিল, শেষ করে ফেললেন ধীরে ধীরে।

তারপর মুখ ফিরিয়ে চুপটি করে ভাবতে লাগলেন। একটু একটু করে সব ঘটনা যেন মনে পড়তে লাগলো। ইতিমধ্যে আর্শাস আর লিজিয়া এলো। লিজিয়া মৃদু-স্বরে বললে—তোমার সঙ্গে আর্শাসের কি কথা আছে···ও বলতে চায়।

—ওর আবার কি কথা?

দু'চোখের সরল দৃষ্টি মার্কাসের মুখে নিবদ্ধ করে করুণ কণ্ঠে আর্শাস বললে—আপনার বন্ধুকে আমি মেরে ফেলেছি! সেজন্য ক্ষমা···।

—বন্ধু! ঐ ক্রোটোন? তাকে মেরে ফেলেছো! বলো কি? আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম, মনে করলে তুমি পৃথিবীর সেরা পালোয়ান হতে পারো। সে গ্রীকটাকেও মেরেছো নাকি?

—না, তাকে আমি দেখিনি!

—পালিয়েছে নিশ্চয়।—হেসে উঠলেন মার্কাস।

লিজিয়া বললে—তুমি বলো আর্শাসকে—ওকে ক্ষমা করেছো!

—ক্ষমা কিসের? উদাস কণ্ঠে মার্কাস বললেন—এতে আমার

ক্ষমা করবার কি আছে ? ক্রোটোনের মত লোক মরবার জন্য সবসময়ে প্রস্তুত থাকে। খুন যাদের পেশা, তারা যদি কোনোদিন মারা যায়, তাতে কোনো নালিশ থাকতে পারে না! কিন্তু কথাটা কি জানো, আর্শাস, আমাকেও তুমি মেরে ফেললে না কেন ?

আর্শাস বললে—আমাদের ধর্ম্মে হত্যা পাপ !

ব্যঙ্গের সুরে মার্কাস বললেন—বটে !

আর্শাস অসহায় দৃষ্টিতে লিজিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।—লিজিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে ! অনেকক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করে একটু উত্তেজিত কণ্ঠে মার্কাস বললেন—আর্শাসের উচিত ছিল আমাকেও মেরে ফেলা ! তুমি ওকে বললে না কেন, আমায় মেরে ফেলতে ? মেরে ফেলবার এমন সুযোগ পেয়েও আমায় তুমি মারলে না—উল্‌টে ঘরে এনে সেবা করে বাঁচিয়ে তুললে ! অথচ তুমি আমাকে ঘৃণা করো ! নাঃ, তুমি আমায় হার মানালে ! তোমার আর লুকিয়ে থাকবার দরকার নেই। আমি আর তোমাকে ধরে নিয়ে যাবার কোনো চেষ্টা করবো না। আমার বন্ধন থেকে তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম, লিজিয়া !

বলতে বলতে মার্কাস ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, লিজিয়া ব্যথিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে !

মার্কাস বেরিয়ে যাবেন, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে রুক্ষস্বরে বললেন—রেহাই পেলে, তবু এতে আনন্দ দেখছি না তো তোমার !

লিজিয়া ভেঙ্গে পড়লো।

দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে সে বললে—আমি তোমায় ঘৃণা করি,

মার্কাস! তুমি জানো না তোমাকে আমার কত ভালো লাগে! তোমায় আমি ভালোবাসি!

মার্কাস অবাক হয়ে চেয়ে থাকে লিজিয়ার দিকে।

মার্কাস মন স্থির করে ফেললেন···লিজিয়াকে তিনি বিবাহ করবেন। এখনই তিনি লিজিয়াকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান! পেত্রোনিয়াস অ্যান্টিয়ামে চলে গেছেন। লিজিয়াকে মার্কাস সেইখানে নিয়ে যাবেন—রীতিমত সমারোহে বিবাহ হবে লিজিয়ার সঙ্গে মার্কাসের।

লিজিয়া দেওয়ালের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালো। সেখানে একটি কাঠের ক্রশ ঝুলছে। লিজিয়া বললো—পলের আসবার কথা আছে। বিয়ের মন্ত্র তিনি পড়ালেই আমি সুখী হবো।

—মন্ত্র আবার কী? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন মার্কাস।

—আছে···মন্ত্র আছে। খৃষ্টান-বিবাহের মন্ত্র! পিটারের বক্তৃতা, পলের বক্তৃতা তুমি শুনেছো তো! তাঁরাই মন্ত্র পড়ে আমাদের বিবাহ দেবেন।

—তুমি ওই কাঠখানির দিকে অমন করে চাইছো কেন? জিজ্ঞাসা করেন মার্কাস।

—ঐ তো আমাদের পবিত্র ক্রশ!

—তোমাদের খৃষ্টের প্রতীক!

—ঐ ক্রশের উপরই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছিল।

—লিজিয়া···তুমি যদি বলো, তাহলে আমিও তোমাদের ধর্ম্ম নিতে প্রস্তুত আছি।

—আমি কেন বলবো ? তোমার বিশ্বাস হয়, তুমি নিজে নেবে এ ধর্ম্ম !

—সিসিলিতে আমাদের বাগানে আমরা এক বিরাট ক্রশ প্রতিষ্ঠা করবো। তার উপর থাকবে যীশুর মূর্ত্তি। এট্‌নার সাদা পাথর দিয়ে আমি সে-মূর্ত্তি তৈরী করাবো। পিটারের কাছ থেকে জেনে নেবো—তাঁর মূর্ত্তি কী রকম ছিল! এমনিই আমাদের দেশে হাজার-দু'হাজার দেবতা আছেন, বেশী আর একজন হলে কী তাতে এসে যাবে ?

—দেবতাকে বিশ্বাস না করলে, ভক্তি না করলে, শুধু মূর্ত্তি গড়লে তাঁর তৃপ্তি হয় না ! আমি চাই, তুমি যীশুকে বুঝে তাঁকে মনের মধ্যে পাও—আমি যেমন পেয়েছি !

—তুমি পেয়েছো ? যীশুকে তুমি মনে পেয়েছো। তাহলে আমাকে তুমি স্থান দেবে কোথায় ? না, না, লিজিয়া, তোমার মনে আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে, এ আমি সহ্য করতে পারবো না। যীশুকে তুমি মন থেকে সরাও !

লিজিয়ার মাথায় বজ্রাঘাত হলো যেন ! সে দু'পা সরে গিয়ে মার্কাসের দিকে উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। এমন সময় সেখানে প্রবেশ করলেন পল। তাঁকে দেখেই মার্কাস ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। পল কিন্তু সে ক্রোধ দেখেও দেখলেন না। শান্ত-স্নিগ্ধ স্বরে তিনি বললেন—তুমি কতক সুস্থ হয়ে উঠেছো দেখে আমরা নিশ্চিন্ত বোধ করছি। দু'দিন তোমার জন্য খুবই অশান্তি ভোগ করেছি আমরা।

লিজিয়া বললে—মার্কাস এইমাত্র বলেছেন পল, তিনি আমায় বিবাহ করতে চান।

এমন খবর পল মোটে প্রত্যাশা করেননি! মার্কাসের সম্বন্ধে তাঁর যে বিরূপ ধারণা ছিল, তা একেবারে দূর হয়ে গেল অন্তর থেকে। তাঁর দিকে তাকিয়ে পল বললেন—তাই নাকি মার্কাস? লিজিয়ার পক্ষে বড় আনন্দের কথা তো!

বাধা দিয়ে লিজিয়া বললো—খুবই আনন্দ, পল! কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম যে আমাদের জীবনের সবটা জুড়ে রয়েছে, এ আমি ওঁকে বোঝাতে পারছি না।

পল বললেন—বুঝেছি।

বাধা দিয়ে পরুষ কণ্ঠে মার্কাস বললেন—আমি কিছু বুঝতে চাই না। শুনুন মশায়, আমি বলেছি লিজিয়ার দেবতার পবিত্র ক্রশ—আমি নিজের গৃহে রাখবো—এর বেশী আর আমি কি করতে পারি? আমার দেবতাদের সে স্বীকার করুক, এমন দাবী আমি করিনি! এর চেয়ে বেশী আর আমি কী করতে পারি?

পল উত্তর দিলেন—সত্যের উপলব্ধি দীর্ঘ সাধনার বস্তু। তোমার সাধনা এখন এই সবে সুরু হলো বন্ধু!

—সাধনা! সে আবার কি?

—বুঝিয়ে দিচ্ছি। একটা কথার জবাব দাও। তোমার দাস-দাসী আছে, কেমন?

—শত শত! ভালো ভালো দাস-দাসী। কিন্তু সে কথা কেন?

—যীশু বলেন, কোনো মানুষ অপরের দাসত্ব করবে না। তোমার

উচিত, এখনই ঐ দাস-দাসীদের মুক্ত করে দেওয়া।—কোন মানুষ কারো সম্পত্তি নয়, হতে পারে না। সব মানুষই সমান। যদি যীশুকে স্বীকার করতে হয়, তাহলে সর্ব্বপ্রথম দরকার, সব মানুষকে ভালোবাসা···

মার্কাস ব্যঙ্গ করে বললেন—তোমাদের ঐ বুড়ো জেলেটা ঐ কথাই বলছিল বটে! তুমি আবার বলছো পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ভালোবাসতে হবে আমাকে! পার্থিয়ান, মিশরী, ইরাণী, সবাইকে? যারা আমার দেশের চির-শত্রু? সুযোগ পেলেই যারা আমার বুকে বিঁধিয়ে দেবে বর্শার ফলা?

শান্ত কণ্ঠে পল বলেন—এ-কথা বোধ হয় তোমার কখনো মনে হয়নি যে, যুদ্ধবিগ্রহ চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে উঠে যাওয়া উচিত? এ-কথাও কোনদিন তুমি ভাবোনি বোধ হয় যে, অস্ত্রের পরিবর্ত্তে ভালোবাসা দিয়েই মানুষকে জয় করা যায়? এবং সেই জয়ই হলো আসল জয়!

মার্কাস ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন—কী সব বলছো তুমি? একগাছা পালক গায়ে বুলিয়ে নেকড়ে-বাঘকে পোষ মানাতে চাও? যেমন তোমাদের দেবতা, তেমনি তোমরা! ক্রন্দন ছাড়া তোমাদের সম্বল নেই! ক্রীতদাসের, ভিখারীর, নৈরাশ্য-পীড়িতদের দেবতা হবারই যোগ্য ঐ যীশু! কিন্তু লিজিয়া তো ওদের নয়! সুতরাং চলো লিজিয়া, তোমার আঙ্গরাখাটা পরে এসো।

লিজিয়া এতক্ষণ এ বিতর্ক মন দিয়ে শুনেছে। শুনেছে আর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে! মার্কাসের সঙ্গে তার মিলনের যে অতি

প্রকাণ্ড অন্তরায় রয়েছে, তা সে উপলব্ধি করেছে মর্ম্মে মর্ম্মে। দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। মনের মিল দু'জনের কখনো হবে না। সুতরাং তাদের বিবাহে সুখের আশা কোথায়?

মার্কাস আবার তাকে ব্যগ্রভাবে আহ্বান করলেন। লিজিয়া অনুনয় করে বললে—একটু···এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করো মার্কাস!

—কী জন্য? অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলেন মার্কাস।—তুমি সেনাপতি মার্কাস ভিনিসিয়াসের পত্নী হতে চলেছো—ভিখারীর দেবতা যীশুর দাস হবার জন্য তোমার জন্ম নয়!

লিজিয়া কাতর কণ্ঠে বলে উঠলো—না, না! তুমি বুঝে দেখ মার্কাস! তুমি জানো না, আমার এই ধর্ম্ম-বিশ্বাস কতখানি গভীর! আমার দেহের প্রত্যেক রক্ত-কণিকায় তা মিশে গিয়েছে। প্রভু যীশু আমার সমস্ত চেতনা জুড়ে আসন পেতে বসে আছেন! তুমি দয়া করে একবার আমার কথা ভেবে দেখ। তোমাকে রাখতে গিয়ে যদি যীশুকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, কিংবা যীশুকে রাখতে গিয়ে যদি তোমাকে হারাতে হয়, তাহলে আমার মত হতভাগিনী আর কে? সে মন্দ ভাগ্য থেকে আমায় তুমি রক্ষা করো!

—একজনকে রাখতে গিয়ে আর একজনকে বিসর্জ্জন! যীশু তাহলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী? বেশ, তাহলে তুমি এই দণ্ডে বেছে নাও—যীশু, না, মার্কাস! দেবতা হোক আর মানুষ হোক, কারও সঙ্গে তোমার স্নেহ ভাগাভাগি করতে আমি রাজী নই। হয় তোমার হৃদয় সম্পূর্ণ আমার হোক, নয় সে হৃদয় থেকে আমায় নির্ব্বাসিত করো তুমি!

লিজিয়া নিরুত্তর—তখনও সেই আগের মত দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছে সে। পল এগিয়ে গেলেন মার্কাসের কাছে, তাঁর কাঁধে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বললেন—শোনো বৎস, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা যত গভীর, যত প্রবল হোক, বিশ্ব-ভালোবাসার তুলনায় সে কতটুকু! মানুষকে ভালোবাসতে শিখলে মানুষ মহৎ হয়। আর সে ভালোবাসার শিক্ষা আমরা পাই যীশুর কাছে, যীশুর জীবনে! যীশুই আমাদের নিজস্ব আচার্য্য। তাঁকে ত্যাগ করে তোমাকে সর্ব্বস্ব করে তুললে লিজিয়ার তাতে মঙ্গল হবে না!

পলের হাত মার্কাস সবলে ঠেলে দিলেন কাঁধের উপর থেকে। তারপর বেশ কঠিন স্বরে বললেন—মূর্খ! তোমার আর ঐ বুড়ো জেলের মতলব আমি বুঝেছি! মুখে মিষ্টি কথা···বিনয়ে নুয়ে পড়া ভঙ্গী—এ শুধু ভুলিয়ে পূজা আদায় করা। তবু···তোমাদের এ সব অনুষ্ঠানে আমি বাধা দিতে চাই না—এ কথা আমার মুখে কখনো প্রকাশ পাবে না! তবে যদি ধর্ম্ম-বিপ্লবের তলে তলে তোমরা রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করো, জেনো, আমার হাতে তলোয়ার থাকতে —আমি তা হতে দেবো না।

তারপর লিজিয়ার দিকে তাকিয়ে তিনি কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন —তুমি তাহলে আমার সঙ্গে যাবে না?

—না! সজল চক্ষে দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলে অভাগিনী।

পাগলের মতন মার্কাস এদিকে ওদিকে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন! কি তিনি করবেন? এখন···এখন···এখন কি করবেন?

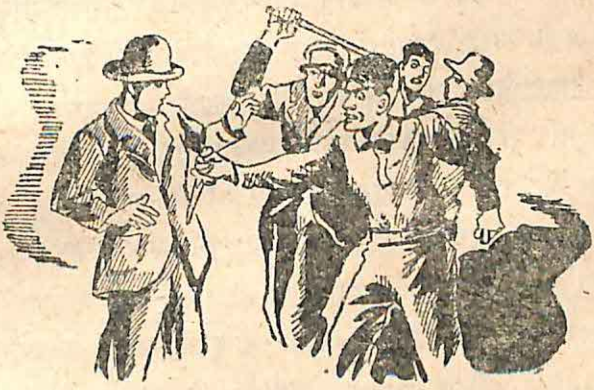
লিজিয়ার বুকে বিঁধিয়ে দেবেন ছোরাখানা? না, ওর গলা টিপে ধরবেন? না···না···?

কিন্তু এ সব কিছু করলেন না মার্কাস—ছুটে গিয়ে দেওয়াল থেকে কাঠের ক্রশটা উপড়ে টেনে তুললেন···তুলে হাঁটুর চাপে সেখানা ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করে মাটীতে ফেলে দিলেন।

দিয়ে তাকালেন লিজিয়ার দিকে। লিজিয়া ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেতনা নেই—স্পন্দন নেই যেন!

তারপর কোনো কথা নয়—মার্কাস পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

পাথরের মত লিজিয়া দাঁড়িয়ে থাকে···শুধু তার দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে। সেই টুক্‌রো কাঠগুলোর উপর বুক দিয়ে শুয়ে পড়লো।



সাত

পাগলের মত রাজপথে ছুটে বেরুলেন মার্কাস। একমাত্র চিন্তা তাঁর মাথায়—দূরে, বহু দূরে চলে যেতে হবে এই নিষ্ঠুরা লিজিয়াকে ছেড়ে! এই অভিশপ্ত রোম চিরকালের মত ত্যাগ করে যাবেন তিনি। মাতুল পেত্রোনিয়াস সম্রাট-দরবারের সঙ্গে এ্যান্টিয়ামে গিয়েছেন। মার্কাসকে সঙ্গে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন তিনি। তখন লিজিয়ার মোহে সে আমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রেছিলেন মার্কাস! সে ভুল এখনই সংশোধন করবেন তিনি।

কী ভাবে যে তিনি পেত্রোনিয়াসের রোমের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন, তা তিনি বুঝতেও পারলেন না। গৃহে নেই তখন মালিক। প্রধান দাস-দাসীরা কেউ নেই। আছে কতকগুলি সাধারণ ভৃত্য। তারা মার্কাসকে দেখে তটস্থ হয়ে তাঁর আপ্যায়নে মন দিলে! মার্কাস প্রথমে স্নান করে ফেললেন, তারপর সামান্য কিছু আহার করে নিয়ে বেশ-পরিবর্ত্তনে মনোযোগ দিলেন। সম্রাটের দরবারে যেতে হবে, সেখানে দু'চারদিন সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীর চোখের সামনেই বাস করতে হবে হয়তো! সুতরাং পদমর্য্যাদার উপযোগী বেশভূষা দরকার। মার্কাস একান্ত নিষ্ঠা-ভরে বেশ পরিবর্ত্তন করতে সুরু করেন। বেশভূষা সম্পূর্ণ করে মার্কাস বেরিয়ে পড়লেন। বাড়ীর সামনে তাঁর রথ অপেক্ষা করছিল, রথে উঠলেন।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী এ্যান্টিয়াম খুব বেশী দূরে নয়। ক-ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সেখানে পৌঁছে গেলেন। ইংরেজী 'ইউ' অক্ষরের ছাঁদে গড়ে-

তোলা এক মর্ম্মর-প্রাসাদে নীরো বাস করেন। তার প্রশস্ত চত্বরে পাশাপাশি তিনটি তাঁবু পড়েছে। প্রাসাদের মধ্যে অত্যধিক গরম, তাই খোলা জায়গায় শিবির স্থাপিত হয়েছে সম্রাট, সম্রাজ্ঞী আর প্রধান পারিষদ পেত্রোনিয়াসের জন্য। মাঝের শিবিরে থাকেন নীরো, তাঁর একপাশে সম্রাজ্ঞী পপ্পিয়া, অন্যপাশে পেত্রোনিয়াস। তাইজেলিনাস এখানে এসে তার পরই আবার রোমে ফিরে গিয়েছেন। নাহলে তাঁর জন্যও হয়তো স্বতন্ত্র পটাবাসের প্রয়োজন হতো।

মার্কাস সোজা গিয়ে উঠলেন পেত্রোনিয়াসের তাঁবুতে। সেখানে বিশ্রাম। তারপর পরস্পরে কুশল প্রশ্ন। অতঃপর সময় কাটাবার জন্য দাবা খেলা। পেত্রোনিয়াস এখানে এসে অখণ্ড অবসর ভোগ করছেন। কারণ, সম্রাট আজকাল স্থপতি ফেরনকে নিয়ে নিজের তাঁবুতে সর্ব্বদা কী যেন গোপন পরামর্শে মগ্ন। সে তাঁবুতে প্রবেশ করবার অধিকার নেই কারুর—পেত্রোনিয়াসেরও নয়।

সম্রাটের তাঁবুতে সম্রাট আর ফেরন!

নীরোর সামনে এক আদর্শ সহরের নমুনা। ফেরন তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এর গঠন-পরিকল্পনা। এখানে বাড়ীর গায়ে বাড়ী থাকবে না—প্রত্যেকটা বাড়ী প্রাসাদের মত সুরম্য হবে। তার চারিধার ঘিরে থাকবে এক-একটা সরোবর। সেই সব সরোবরে ফুটবে পদ্ম। সরোবরের জলে ভেসে বেড়াবে মরাল-মরালী। সরোবরগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে অনতিপ্রশস্ত এক খালের দ্বারা। সেইটি হবে নগরের চলাচলের প্রধান পথ। অবশ্য সে জল-পথের ধার দিয়ে মনোরম স্থল-পথও থাকবে। দুধের-মত-সাদা পাথরে ঢাকা সে পথের

দু'ধারে সারি সারি বড় বড় পুষ্পতরু থাকবে—ফুলভারে অবনত হয়ে। দীন-দুঃখীদের প্রবেশের অধিকার থাকবে না সে নগরে। শুধু সম্ভ্রান্ত আর সৌখীন অভিজাত সমাজের বসতি থাকবে সেখানে।

বহুদিন থেকে নীরো মনে মনে এই রকম একটা অপূর্ব্ব সুন্দর সহর গড়ে তোলবার কথা কল্পনা করছিলেন। বর্ত্তমান রোম অত্যন্ত নোংরা, যেখানে-সেখানে পঙ্কিল নর্দ্দমা, অস্বাস্থ্যকর বস্তি। উদ্যানের অভাব, জলাশয়ের অভাব। এ রোম নীরোর মত সম্রাটের যোগ্য রাজধানী নয়। তাই তিনি নতুন রাজধানী নির্ম্মাণের সংকল্প করেছেন —তার নাম হবে নীরোপোলিস্ বা নীরোর নগর।

ফেরন উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় গদ্-গদ্ হয়ে উঠছেন। এ কল্পনা শুধু নীরোর মত প্রতিভাধরের মস্তিষ্কেই উদয় হওয়া সম্ভব। নীরো জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী,—হোমারের চেয়ে বড় কবি, অর্ফিউসের চেয়ে বড় গায়ক। কিন্তু তাঁর বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয় এ পরিকল্পনার মধ্যে যে-রকম পরিস্ফুট হয়েছে, এমন আর কোনো কিছুতে পূর্ব্বে কখনো হয়নি!

পারিষদবর্গের এই নির্জ্জলা তোষামোদে নীরোর মনে ধারণা জন্মেছে, সত্যই তিনি জগতে অদ্বিতীয়···দ্বিতীয়-ঈশ্বর! সেই জন্যে অসাধারণ একটা কিছু করতে হবে! আদর্শ নগরীর নমুনা দেখাবার জন্য তখনই তিনি পেত্রোনিয়াস এবং অন্য বন্ধুদের আহ্বান করে পাঠালেন! এ আদেশ তখনি পালিত হলো। পেত্রোনিয়াস একা এলেন না, তাঁর সঙ্গে এলেন সেনাপতি মার্কাসও।

প্রস্তাবিত নব-নগরীর সৌন্দর্য্য একে একে বিশ্লেষণ করতে লাগলেন

নীরো। প্রাচীন রোম আর থাকবে না, তার বদলে গড়ে উঠবে এই স্বপ্নপুরী নীরোপোলিস্। এখানে দৈন্যের ছায়া দেখা যাবে না কোন-দিন—অধিবাসীদের মুখের হাসি থাকবে অমলিন! প্রাসাদে মন্দিরে উদ্যানে—এ হবে পৃথিবীতে আনন্দের কেন্দ্রমণি!

পেত্রোনিয়াস আর থাকতে পারলেন না—দরবারী কায়দা বিস্মৃত হয়ে বলে উঠলেন—কিন্তু রোম যাবে কোথায়? রোম যেখানে আছে, সেইখানেই এই নতুন নগর যদি গড়ে তুলতে হয়, তাহলে রোমকে আগে বিধ্বস্ত করা দরকার? কিন্তু দেবতাদের অনুগ্রহ, রোম এখনো বিধ্বস্ত হয়নি! নোংরা হোক, অস্বাস্থ্যকর হোক, এখনও আমাদের প্রাচীন রোম স্বস্থানে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে!

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে নীরো বললেন—প্রাচীন রোম এখনো স্বস্থানে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে! যা বলেছো, বন্ধু! রোম এখনো স্বস্থানে! এই যে তাইজেলিনাস। কী খবর তোমার?

পেত্রোনিয়াস জানতেন এ্যান্টিয়ামে এসেই নীরো তাইজেলিনাসকে রোমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তাইজেলিনাস এইমাত্র রোম থেকে ফিরে এলেন। সম্রাট বললেন—রোম এখনো স্বস্থানে দাঁড়িয়ে আছে কিনা, ইনি তার খাঁটি খবর দিতে পারবেন!

সম্রাটের প্রশ্ন শুনে বা হয়তো না-শুনেই তাইজেলিনাস বলে উঠলেন—জয় হোক সীজারের! সারা রোম আগুনে জ্বলছে! রোম এখন আগুনের সমুদ্র!

পেত্রোনিয়াসের চোখের সামনে থেকে একটা কালো পর্দ্দা খসে পড়লো হঠাৎ! নর-দানব নীরো তাহলে রোমে আগুন দিয়েছে!

তারই আদেশে পশু তাইজেলিনাস রোমে গিয়েছিল ঐ আগুন দেবার জন্যই? নীরো একদা ট্রয়-নগরী-ধ্বংসের বর্ণনা করে এক কবিতা লিখেছিলেন—পেত্রোনিয়াস সে-কবিতার প্রশংসা করেননি! ত্রুটি দেখিয়েছিলেন এই বলে যে, আগুনের বর্ণনা তেমন জীবন্ত হয়নি! সম্রাটের রোষ অপনোদনের জন্য কারণ দেখিয়েছিলেন—নীরো তো কখনো কোনো নগর জ্বলে পুড়ে ভস্ম হতে দেখেননি! কাজেই তিনি অদেখা জিনিস বর্ণনা করবেন কিরূপে?

পেত্রোনিয়াসের মনে হলো, হয়তো আগুন বর্ণনার উপযুক্ত প্রেরণা পাবার আশাতেই নীরো রোমে আগুন লাগিয়েছেন! তার মূলে নব-নগরী গঠনের নেশাও ছিল অবশ্য! এই উন্মাদ নীরো জীবনে অনেক কুকাজ করেছেন! মাতাকে হত্যা করিয়েছিলেন! পত্নীকে বাদ দেননি—কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন চমৎকার! ওদের আমি দেবতার উদ্দেশে বলি দিয়েছি! প্রিয় বস্তুকেই বলি দিতে হয় দেবতার কাছে! দেবতারা এবার প্রসন্ন হয়ে আমায় বর দেবেন!

পেত্রোনিয়াস বলেছিলেন—কী বর আপনার কাম্য?

উত্তরে নীরো বলেছিলেন—পৃথিবীর যা কিছু শ্রেষ্ঠ···কামনার সেরা যা-কিছু আছে, তার সব আমি পেয়েছি। ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, সুখ, শান্তি, যশ, কীর্ত্তি—অভাব আমার কিছুই নেই! পাইনি শুধু সত্যের সন্ধান! যে-সত্য স্বর্গের নিজস্ব সম্পদ, তা থেকে আমি এখনো বঞ্চিত! সে-সত্যের বিন্দুমাত্র আভাস পেয়ে ভাষা বা ভাবের সাহায্যে সে আভাসটুকু যে ব্যক্তি প্রকাশ করতে পারে, জগতে সে পূজিত হয় প্রতিভাধর বলে! আমি প্রতিভাধর, সত্য। অবিনশ্বর সত্যের

আভাস মাঝে-মাঝে আমি পেয়ে থাকি, তাতে সন্দেহ নেই। আমার কবিতা আর গানের ভিতর দিয়ে সে-আভাস ফুটে ওঠে মাঝে মাঝে। কিন্তু ওটুকুতে তৃপ্ত হওয়ার মত ক্ষুদ্র প্রাণ নীরোর নয়! নীরো চায় আকাশের সূর্য্যের মত জ্বলন্ত অখণ্ড সত্যকে নিজের হৃদয়ের গভীর ভিতরে পেতে! তারই জন্য আমি মাতৃবলি দিয়েছি, প্রিয়তমা পত্নীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি নিজের হাতে।

পেত্রোনিয়াস আজ ভাবছেন, সহস্র বৎসরের সুপ্রাচীন রোম নগরীকেও সেই সত্যান্বেষী ধ্বংসের মুখে ঠেলে এ দানব দিয়েছে না কি মহাসত্য-উপলব্ধির আশায়?

* * *

কিন্তু পেত্রোনিয়াস যতক্ষণ ভাবছেন, মার্কাস ততক্ষণে এ-সংবাদ শুনে দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন! রোম দগ্ধ হচ্ছে! তার কানায় কানায় আগুন জ্বলছে! প্রলয়-আগুন! ধ্বংস হতে বসেছে সেই মহানগরী, যার এক দরিদ্র পল্লীতে বাস করে লিজিয়া! লিজিয়া প্রত্যাখ্যান করেছে মার্কাসকে—কিন্তু সে-প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও মার্কাস তাকে ভুলতে পারেননি! ক্রোধের বশে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল—লিজিয়াকে নিজের জীবন থেকে একেবারে নির্ব্বাসিত করে দিতে পেরেছেন তিনি! কিন্তু লিজিয়া হয়তো আগুনের বেড়া-জালে পড়ে পুড়ে মরতে চলেছে! এ কথা মনে উদয় হতেই সব রাগ চোখের পলকে অনুরাগে পরিণত হলো আবার! মার্কাস বুঝতে পারলেন, লিজিয়াকে তিনি ভুলতে পারেননি! পারবেন না কোনোদিন! তিনি নিজের জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ করে ফেলেছেন লিজিয়াকে—নিজের অজ্ঞাতসারে!

তাইজেলিনাসকে একদিকে টেনে এনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—সমস্ত রোমই কি জ্বলছে ?

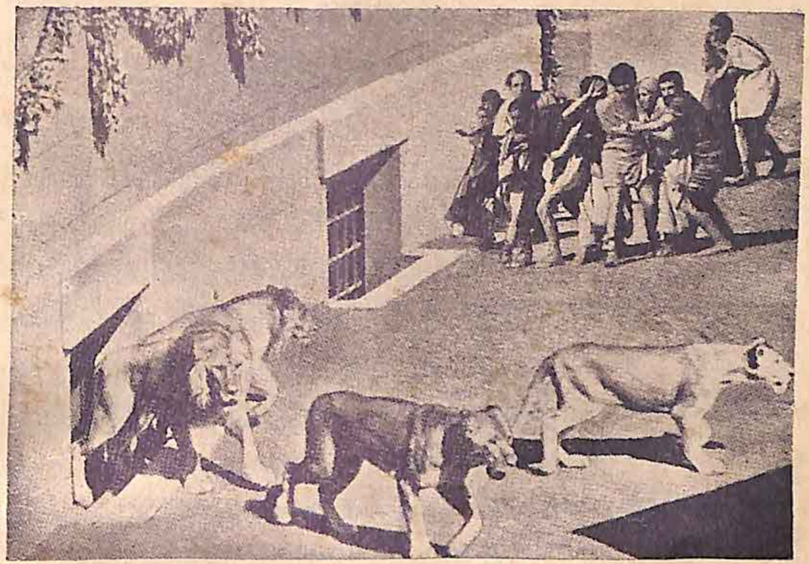
তাইজেলিনাস ভাবলেন, এ শুধু মার্কাসের একটা বাজে কৌতূহল! তিনি হাল্‌কা সুরে উত্তর দিলেন—কেবল পালাতিন পাহাড়ের দিকটা বাদে। ঐ সৌখীন মহল্লাটা আমরা বাঁচাবো!

—কিন্তু নদীর ও-পারটা ?

—ওঃ, ওঃ, সেখানে আগুন জ্বলছে—ঠিক নরকের আগুনের মত! মিনিটে মিনিটে হাজারটা ছাদ ধ্বসে পড়ছে শোলার ছাদের মতো।

তাইজেলিনাসের বর্ণনা শোনবার জন্য মার্কাস আর অপেক্ষা করলেন না। ছুটে বেরিয়ে গেলেন সম্রাটের শিবির থেকে। প্রাসাদ-চত্বরে অনেক রথ সজ্জিত ছিল। তার একখানাতে লাফিয়ে উঠে মার্কাস তীরের বেগে রাজপথে গিয়ে পড়লেন। কিন্তু এভাবে সম্রাটের অনুমতি না নিয়ে দরবার থেকে হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়া অত্যন্ত রীতি-বিরুদ্ধ কাজ! দু'জন সেনানায়ক সম্রাজ্ঞীর ইঙ্গিতে মার্কাসের পিছনে ছুটলো দ্রুতগামী রথে। মার্কাসকে ধরে আনবে তারা।

তাদের রথের অশ্ব ছিল মার্কাসের অশ্বের চেয়েও তেজী। মার্কাসের পাশ কাটিয়ে তারা গেল খানিক এগিয়ে। যদি এখন ঘুরে দাঁড়ায়, মার্কাসের রথের গতি রুদ্ধ হবে! তাই হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ মার্কাস কোমর থেকে ছোরা টেনে নিয়ে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করলেন এমন বিচিত্র কৌশলে যে, আকাশে উঠে কটা ঘুরপাক খেয়ে সেটা গিয়ে অগ্রবর্ত্তী রথীর ঠিক পাঁজরায় বিদ্ধ হলো। সে অভাগা লুটিয়ে পড়লে রথের



এক এক লাফে···এসে পড়েছে এক একটি অতিকায় সিংহ



দশকরা লিজিয়া আর মার্কাসকে ঘিরে রেখেছে

[ছবি—মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারের সৌজন্যে

উপর! আর সেই মুহূর্ত্তেই মার্কাসের রথ তাকে অতিক্রম করে চলে গেল সামনে।

কিন্তু অন্য রথখানা এসে পড়েছে। তারও গতিবেগ মার্কাসের রথের চেয়ে বেশী। সেও পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল এই ভরসায় যে কোমরে আর ছোরা থাকা সম্ভব নয়! সত্যই একখানার বেশী ছোরা কোনো সৈনিক রাখে না কোনোকালে। মার্কাস তো নয়ই। কাজেই সেদিক দিয়ে এই নতুন শত্রু নিরাপদ বই কি!

কিন্তু বুদ্ধি ও সাহস দুটোই যার আছে, তার সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত। ঐ শত্রুর কণ্ঠ লক্ষ্য করে নিজের দীর্ঘ চাবুক তিনি এমনভাবে হাঁকড়ালেন যে তার অগ্রভাগ তিনটি প্যাঁচ দিয়ে ওর গলায় জড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মার্কাস সবল হাতে সেই চাবুক আকর্ষণ করলেন। আঁকসির আগায় পাকা ফলের মত রথের উপর চিৎ হয়ে পড়ে গেল বেচারী রথী! তার হাতে ঘোড়াদের লাগাম, টানের জোরে ঘোড়ারা শিষ-পা হয়ে উঠলো, রথ গেল উল্‌টে—আর সেই উল্‌টানো রথ টানতে টানতে চালকহীন ঘোড়াগুলো লাফিয়ে গিয়ে পড়লো মাঠের মধ্যে। দুর্ভাগা আরোহীর হতচেতন দেহ তখনো সেই রথের চাকার ফাঁকে আটকানো রয়েছে!

শত্রুদের নিরস্ত করে মার্কাস এবার তীরের বেগে রথ ছুটিয়ে দিলেন। রোমের নিকটে এলেন ক্রমে। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়লো সামনের সমস্ত আকাশ বিচিত্র গোলাপী আভায় ভরে উঠেছে! ঊষার আলো? অসম্ভব নয়! কারণ রাত্রি প্রভাত হওয়ার সময় হলো!

কিন্তু না, ঊষালোক নয়! এপিয়ান ওয়ে যেখানে পাহাড়ের মাথা

টপকে রোমের দিকে নেমেছে, সেখানে আসতেই এক আশ্চর্য্য দৃশ্য তাঁর চোখে পড়লো। বিস্ময়ে তিনি রথ থামালেন। পায়ের নীচে দুর্ভেদ্য কালো মেঘ। না, মেঘ নয়, জমাট কালো ধোঁয়া! সেই ধোঁয়ার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেছে সহর, ঘর-বাড়ী, খাল-নদী, গাছপালা—সব কিছু। ঘনকৃষ্ণ সমতল!

কিন্তু সেই মৃত্যু-মলিন সমতলের ওপারে জ্বলছে এক আগুনের সমুদ্র! প্রথম-দৃষ্টিতে মার্কাসের মনে হলো,ও আগুনে কোনো প্রাণীর প্রাণ বাঁচতে পারে না। কোনো ঘর-বাড়ী রক্ষা পেতে পারে না ওর সর্ব্বগ্রাসী কবলে!

এপিয়ান ওয়েতে মানুষের ভিড়। জলস্রোতের মত জনস্রোত বেরিয়ে আসছে রোম থেকে। সবাই পালাচ্ছে, পাছে ঐ অগ্নি-সমুদ্রে তলিয়ে যায়, সেই ভয়ে! অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণীর লোক। মার্কাসের রথ আর বেশভূষা দেখে তাঁকে অভিজাত বংশীয় বলে সকলে বুঝতে পারলো। ইতিমধ্যে মুখে মুখে জনরব রটনা হয়েছে যে নীরোর আদেশে তাইজেলিনাস আগুন দিয়েছে রাজধানীতে! নীরোর উপর এবং তাঁর তাঁবেদার সৈনিক আর পারিষদদের উপর তখন ক্ষেপে উঠেছে গৃহহারা সর্ব্বহারা রোমবাসী। তারা মার্কাসকে দেখে তাঁর উপর রুখে উঠলো। এ লোকটাও একজন অভিজাত! সুতরাং এও সেই শয়তানদের একজন! একেই ঠিক করো আপাততঃ।

মার্কাস বুঝলেন, এই ক্রুদ্ধ জনতার ভিতর দিয়ে রথ নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়! রথ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। তারপর তরবারির মুখে ভিড় পরিষ্কার করে ছুটতে লাগলেন, যেদিকে দু-চোখ যায়! ক্রমে ভিড় থেকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর সম্মুখে সেই

কালো ধোঁয়ার রাজ্য! আঙ্গরাখার প্রান্তে মুখ আর নাক চাপা দিয়ে সেই অসহ্য ধূমের পাথারে তিনি ঝাঁপ দিলেন। দম বন্ধ হয়ে আসে, ফুসফুস ফেটে যাবে মনে হয়, তবু উন্মাদের মত তিনি রোমের দিকে ছুটেছেন!

অবশেষে রোমের প্রাচীর!...খালধারের সেই দরিদ্র পল্লী। মিরিয়ামের বাড়ী ছিল ঐ খালের ধারে, রাস্তার মোড়ে, মার্কাসের মনে আছে। কষ্টে তিনি সে বাড়ী খুঁজে পেলেন। আশে-পাশে আগুনের শিখা হাওয়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দিগ্বিজয়ে ছুটেছে! ভেঙ্গে পড়ছে বাড়ীর পর বাড়ী, ধ্বসে পড়ছে প্রাচীরের পর প্রাচীর! মার্কাস প্রবেশ করলেন মিরিয়ামের গৃহে। সে-গৃহে তখন আগুন জ্বলছে—উপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে!

সে আগুন মাড়িয়ে, সে ধোঁয়ায় অন্ধের মত হাতড়ে মার্কাস কক্ষে কক্ষে ঘুরতে লাগলেন। লিজিয়া? লিজিয়া? আর্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার করছেন তিনি। এই সবে কাল এই গৃহ থেকেই মার্কাস বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেন, রূঢ় ব্যবহারে লিজিয়াকে অশ্রুর সাগরে ভাসিয়ে! তখন কি জানতেন এত শীঘ্র এমন কাতর ভাবে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে এই-খানেই ফিরে আসতে হবে?

লিজিয়া! লিজিয়া!—হাহাকার করছেন মার্কাস। আগুনের প্রমত্ত গর্জ্জন ছাপিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সে হাহাকার! তবু লিজিয়ার কোন সাড়া নেই! সে কি তাহলে বেঁচে নেই? এ অসহ্য চিন্তাকে সবলে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ঘর ছেড়ে রাস্তায় ছুটে বেরুলেন মার্কাস। তখনও তাঁর মুখে সেই এক আর্ত্ত আহ্বান—লিজিয়া! লিজিয়া! কোথায় লিজিয়া!

আট

পথে তখন চলেছে প্রলয় কাণ্ড। এদিক থেকে ঘর ভেঙ্গে পড়ছে পথের উপর, আর দিক থেকে ভয়ার্ত্ত নর-নারীর দল জড়াজড়ি হুড়োহুড়ি করে সেখানে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে! চারিদিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী,—জমাট, কালো ধোঁয়া···পাথরের মত দুর্ভেদ্য—বুকের উপর চেপে বসে, দম বন্ধ হয়ে যায়! আগুনের হল্‌কা যতক্ষণ না ধূমকেতুর ল্যাজের মত এদিক পানে আঁধার-রাজ্যের উপর ছড়িয়ে পড়ে, ততক্ষণ চোখে কিছু দেখা যায় না!

পথ হাতড়ে টলতে টলতে মার্কাস কোন মতে এগিয়ে চলেছেন। কতক্ষণ চলেছেন, তাঁর খেয়াল নেই! হঠাৎ দেখলেন—সামনে আর পথ নেই। অর্থাৎ পথ ছিল, তার উপর জ্বলন্ত একটা গোটা-বাড়ী ধ্বসে পড়েছে! হতাশ হয়ে ডানদিকে তিনি তাকান, সেখানে গভীর খাত—নীচে খরস্রোত খাল। ও-খাল পার হবার কোন উপায় সেখানে নেই! বাঁদিকেও সারি সারি বাড়ী জ্বলছে, তার মধ্যে একটা আবার মার্কাসের চোখের উপর ভেঙ্গে রাস্তায় পড়লো—ঠিক মার্কাসের পিছনে!

মার্কাস প্রমাদ গণলেন। চারিদিকেই রাস্তা বন্ধ। আগুন যেন তাঁকে খাঁচায় পূরে পুড়িয়ে মারতে চায়! জমাট কালো ধোঁয়ার ভিতর থেকে হাল্‌কা সাদা ধোঁয়ার দাঁত বেরিয়ে যেন ব্যঙ্গহাস্যে তাঁকে বলছে, লিজিয়াকে কেড়ে নিয়ে এসেছো আমার গ্রাস থেকে, এইবার নিজেকে রক্ষা করো, দেখি!

চারিদিকে আগুন। বাতাস এত তপ্ত হয়ে উঠেছে যে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না! কিন্তু সে-সবে ভ্রূক্ষেপ নেই মার্কাসের! তাঁর ভয় হলো, আর কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়ালে তিনি চৈতন্য হারাবেন! মরিয়া হয়ে তিনি খদের দিকে এক পা অগ্রসর হলেন, ঐ খরস্রোত খালে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই! প্রাণ বাঁচাবার কোন চেষ্টা যদি করতে হয়, তবে ঐ দিক দিয়েই তা করতে হবে!

হঠাৎ এক কাতর আর্ত্তনাদ তাঁর কাণে এলো। বহু লোক যেন একসঙ্গে হাহাকার করছে! চমকে মার্কাস সেই ঘন ধোঁয়ার মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালনের চেষ্টা করতে লাগলেন। ঐ যে! আবছা কতকগুলি মূর্ত্তি দেখা যায়! রাস্তার উপর কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, কেউ হাঁটুর উপর মাথা রেখে বসে বসে ধুঁকছে, কেউ যুক্ত-করে আকাশের দিকে তাকিয়ে জুপিটার বা জুনোর করুণাভিক্ষা করছে! কজন শিশু···থেকে থেকে ককিয়ে উঠছে অব্যক্ত যাতনায়!

মার্কাস দেখলেন—এ লোকগুলির জীবনের কোনো আশা নেই! এরা এমন যে জীবনের জন্য মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে সাহস পায় না! এমন অলস, অনড় ভাবে শুয়ে বসেই এরা মরণকে বরণ করবে দেবতার নাম কণ্ঠে নিয়ে! অভাগা নির্জীব, অপদার্থ···জীবন-ধারণের অযোগ্য!

কিন্তু তখনই মার্কাসের মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো—এদের মন যে এমন পাথর হয়ে গেছে, জীবনে-মরণে কোনো তফাৎ বোঝে না—এর জন্য দায়ী এরা নিজেরা? না, বহুযুগের নিষ্পেষণ-নির্য্যাতন এদের ভারবাহী পশুর পর্য্যায়ে নামিয়ে এনেছে? কশাই যখন মেষকে বলি দেবার জন্য নিয়ে যায়, তখন মেষ বাঁচবার জন্য লড়াই করে না!

তার জন্য তাকে তিরস্কার করা চলে না! রোমের অভিজাত সম্প্রদায়, মার্কাসের মত লোকেরা এদের মনুষ্যত্বটুকু ধীরে ধীরে কেড়ে নিয়েছেন এদের ভিতর থেকে! নাহলে আজ এমন জড়-পুত্তলির অবস্থা এদের হবে কেন? এরাও জাতে রোমান—এদেরও পূর্ব্ব-পুরুষরা একদিন রোমের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল!

মার্কাস বীর—বহু যুদ্ধে মার্কাস অগণ্য মানবের প্রাণ নিয়েছেন. মৃত্যু দেখেছেন উদাসীন ভাবে! উৎফুল্ল হয়েছেন শত্রুকে নিজের হাতে মৃত্যু দিয়ে! এত মৃত্যু তিনি দেখেছেন যে, মৃত্যু দেখে বেদনা-ব্যথা পাবার অনুভূতিটুকুও তাঁর মন থেকে উবে গিয়েছে! সে হিসাবে আজ এই দুর্ভাগা নর-নারী শিশুর দলকে দেখেও না-দেখা তাঁর উচিত ছিল! জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আকুল হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হতো! কিন্তু তা হলো না! লিজিয়ার স্পর্শ তাঁর অন্তরে এক বিরাট বিপর্য্যয় ঘটিয়ে দিয়েছে! তাঁর পুরানো মনকে যেন ভেঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন করে দিয়েছে! সেই নির্জ্জন পাহাড়ে পাথর-খোঁড়া পরিত্যক্ত গহ্বরের ভিতর বৃদ্ধ পিটারের বাণী মেঘমন্দ্রে তাঁর কানে যেন বাজতে লাগলো, প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে নিজের মত·········ওরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান·········ওরা সবাই তোমার পরমাত্মীয়!

সেদিন পিটারের বক্তৃতাকে উন্মাদের প্রলাপ বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন মার্কাস, আজ কিন্তু তা পারলেন না। মৃত্যু-রাজ্যের এই তোরণে দাঁড়িয়ে উপরের দিব্য আলোর একটা ঝলক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর চোখে পড়লো বুঝি! সোনার কাঠির স্পর্শে স্বার্থসর্ব্বস্ব মার্কাসের

আজ নতুন জীবন সুরু হলো: নিজের কথা ভুলে সেই অচেনা লোকগুলিকে কিসে বাঁচানো যায়, এই চিন্তায় তিনি অধীর হলেন!

হঠাৎ পায়ের তলায় লোহার আওয়াজ হলো যেন!

নীচের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, একটা বড় ঝাঁজরি—একটা বড় নর্দ্দমার মুখ। এখান দিয়ে ধাঙ্গড়রা নীচে নামে নর্দ্দমা পরিষ্কার করবার জন্য। রোমের মাটির নীচে এ-রকম সুড়ঙ্গ-পথ বহু মাইল জুড়ে আছে, মার্কাস তা জানেন। এই সব সুড়ঙ্গ যে টাইবার নদীতে গিয়ে শেষ হয়েছে, তাও তাঁর অজানা নয়। বহু চেষ্টা করে ঝাঁজরিটা তিনি খুলে ফেললেন। তারপর ঐ অবসন্ন নির্জ্জীব মানুষগুলোকে ডাক দিলেন—এই ঝাঁজরির মুখে ঢোকবার জন্য।

বৃদ্ধ আর নারীদের হাত ধরে, শিশুদের কোলে করে সুড়ঙ্গের ভিতর নামিয়ে দিতে গিয়ে এক অজানা পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল মার্কাসের দেহ। এ পুলক এর আগে আর কোনদিন তিনি অনুভব করেননি! সেই মৃত্যু আর হাহাকারের মধ্যে, সেই অসহায় অবস্থার মধ্যে কোথা থেকে তাঁর মনে এলো এই অপূর্ব্ব প্রাণ-শক্তি! কাল যাদের পানে চেয়েও দেখেননি, আজ নিজেকে বিপন্ন করেও তাদের উদ্ধার করতে কে তাঁকে এভাবে উদ্বুদ্ধ করলো? প্রতি-বেশীকে ভালোবাসায় এত আনন্দ? পিটার! পিটার! তুমি মিথ্যা বলোনি!

শেষ প্রাণীটি যখন সুড়ঙ্গে নেমে আগুনের হাত থেকে নিরাপদ হলো, তখন মার্কাস একখানা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিলেন অগ্নিকুণ্ড

থেকে। সেটা মশালের কাজ করবে অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে। তারপর মার্কাস ঝাঁপ দিলেন সেই ভূগর্ভের অন্ধকারে। অমনি কোথা থেকে একখানা জ্বলন্ত চালা এসে সেই সুড়ঙ্গ-মুখে পড়লো। বহির্জগৎ থেকে প্রাণভয়ে পলাতক জীব কয়টির সব সংযোগ গেল বিচ্ছিন্ন হয়ে।

সেই মশাল হাতে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ-পথ ধরে মার্কাস এগিয়ে চলেছেন নদীর দিকে—পিছনে একপাল অসহায় নারী পুরুষ শিশু আর বৃদ্ধ। এ-রকম অবস্থায় মার্কাসকে দেখলে তাঁর যোদ্ধা বন্ধুরা হেসে গড়িয়ে পড়তো, সন্দেহ নেই!

দীর্ঘ পথ। অনিশ্চিত পথ। বিপদ-সংকুল পথ। অবশেষে নদী।

সুড়ঙ্গ যেখানে নদীর সঙ্গে মিশেছে, সেখানে প্রায় বুক পর্য্যন্ত জল। সেই জলের ভিতর দাঁড়িয়ে শিশুদের উঁচু করে তুলে ধরে মার্কাস ওপারে রেখে এলেন। সকলে ক্রমে ক্রমে পার হয়ে এলো। মার্কাস তাদের নিয়ে নদীর উঁচু পাড় বেয়ে রাজপথে এসে পড়লেন। সেখানে একটা সেতুর মুখ। সেই সেতুতে উঠলেন মার্কাস। ওপার থেকে দলে-দলে লোক এসে পড়েছে আগুনের মুখে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে! মার্কাস তাদের লক্ষ্য করতে লাগলেন। না জানি, কত পথ দিয়ে কত লক্ষ লক্ষ লোক এইভাবে রোম থেকে পালাচ্ছে! ওদেরই দলে মিশে লিজিয়া কোথায় গিয়ে পড়েছে, কে জানে!

হঠাৎ দৈত্যের মত প্রকাণ্ড একটা মানুষ চোখে পড়লো। মার্কাসের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠলো দ্রুততালে। আর্শাস! নিশ্চয়ই ও আর্শাস! এবং আর্শাস যদি এসে থাকে, তাহলে

কি লিজিয়াকে না নিয়ে এসেছে? না! ঐ, ঐ তো লিজিয়া! ঐ…ঐ!

আর্শাসের পিছনে তিনি দেখেন লিজিয়া আর নাজারিয়াস।

মার্কাসকেও ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেখতে পেলো লিজিয়া। দু' হাত প্রসারিত করে সে ছুটে এলো তাঁর দিকে। মার্কাস মর্ত্যে, না, স্বর্গে, —বুঝতে পারেন না!

নাজারিয়াস কাঁদছে। তার মা মিরিয়াম আগুনে পুড়ে মরে গিয়েছে!

*　　*　　*　　*

নীরো ওদিকে নিশ্চেষ্ট বসে নেই। রোমের আগুনের খবর পেয়ে তিনি ছুটে এসেছেন সেই আগুনের দৃশ্য দেখবার জন্য! হাজার বৎসরের প্রাচীন মহানগরী পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, ট্রয়ের আগুন তো এর কাছে নগণ্য! এবার নীরো যখন আগুনের কবিতা লিখবেন, তখন হোমারকেও তিনি ছাড়িয়ে যাবেন! জগতে তিনি অদ্বিতীয় কবিতার সৃষ্টি করে যাবেন! সেই আনন্দে নেচে ওঠে নীরোর উন্মাদ অন্তর!

নীরো এসেছেন, সম্রাজ্ঞী এসেছেন, দরবারী সদস্যেরাও এসেছেন ব্যস্ত হয়ে! ষোল হাজার প্রিটোরিয়ান গার্ড তাঁদের পাহারা দিচ্ছে। জনরব রটেছে, নীরোই রোমে অগ্নি সংযোগ করেছেন, তার ভস্মস্তূপ সরিয়ে ফেলে সেখানে নতুন নগর গড়ে তোলবার জন্য। এর ফলে রোমের লক্ষ লক্ষ লোক নীরোকে উচ্চকণ্ঠে গালি দিচ্ছে— দেবতাদের অভিশাপ বজ্রের আকারে তাঁর মাথায় ভেঙ্গে পড়ুক,

এই কামনা করছে। কী জানি, এরা যদি শেষ পর্য্যন্ত বিদ্রোহ করে বসে! তাইজেলিনাস তাই সাবধানে পাহারা দিচ্ছেন তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে—সম্রাটের ত্রিসীমায় যাতে কেউ না আসতে পারে, তার জন্যে সতর্ক আছেন সারাক্ষণ।

রোম থেকে একটু দূরে ছাউনি ফেলে অপেক্ষা করছেন নীরো। রাত্রি না হলে তিনি রোমের ধারে আসবেন না। তার কারণ রাত্রেই আগুনের দৃশ্য দেখায় রীতিমত জমকালো—অন্ধকারে আগুনের ফুল ফুটবে—ধোঁয়ার বিন্দুবাষ্প চোখে ঠেকবে না! অপরূপ দৃশ্য! মাঝ রাত্রে তিনি প্রাসাদে এলেন এবং এসেই ছাদে উঠলেন—উঠে আল্‌সের ধারে দাঁড়ালেন আগুন দেখবার জন্য। সঙ্গে আছেন পম্পিয়া, পেত্রোনিয়াস, তাইজেলিনাস এবং আরও অনেকে।

মাথার উপর কি ভয়ঙ্কর ধোঁয়ার চাঁদোয়া! কালো আকাশে নক্ষত্র যেমন দেখায়, কালো ধোঁয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে ফুটে উঠছে তেমনি আগুনের ফুলকি! নীরো আনন্দে আত্মহারা। এই ধ্বংস-লীলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর আশ আর মেটে না! অন্তরের পুলক মুখে ভেসে ওঠে উজ্জ্বল বর্ণে! তিনি স্থান কাল পাত্র ভুলে সগর্ব্বে বলে উঠলেন—রোমের সৃষ্টি থেকে আজ পর্য্যন্ত এমন দৃশ্য কোন রোমান চক্ষে দেখেনি! আমি সৃষ্টি করেছি এই কল্পনাতীত ছবি! আমি গান গাইবো, গানে এ দৃশ্যের অপরূপ সৌন্দর্য্য বর্ণনা করবো। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হয়ে বেঁচে থাকবো চিরকাল! দাও, তার্পনস্, আমার বাঁশী দাও!

তার্পনসের হাত থেকে স্বর্ণমণ্ডিত বাঁশী নিয়ে নীরো তাতে ফুৎকার দিলেন—ঝংকারের পর ঝংকার উঠতে লাগলো। দৃপ্ত বিজয়োল্লাসের সুর নিঃসৃত হলো বাঁশী থেকে। আকাশ তখন ধোঁয়ায় ঢাকা··· কালোয়-কালো।

অনেকক্ষণ বাঁশী বাজিয়ে বাঁশী রেখে তিনি বীণা নিলেন। নিয়ে গান ধরলেন হোমারের ছন্দে—হে আমার পিতৃ-পিতামহের জন্মভূমি···

দিগন্তে তখন আলোর মালা···পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি চলে—আগুনের ঢেউ ছুটেছে মহা-সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত। যেখানে কালো ছিল, সেখানেও হঠাৎ আলো হয়ে উঠলো ঐ! তাইজেলিনাসের দূতেরা নতুন-নতুন পল্লীতে অগ্নিসংযোগ করে ফিরছে। পুরাতন রোমের একখানা পুরাণো ইট ওরা অটুট রাখবে না!

নীরো গান গেয়ে চলেছেন, সঙ্গে যোগ দিয়েছে রাজসভার গায়করা। মাননীয় পারিষদরা সুযোগ পেলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ফেটে পড়ছে একেবারে! একমাত্র পেত্রোনিয়াস নীরব। কারণ রোমকে সত্যই তিনি ভালোবাসেন। সেই রোমের ধ্বংস কিছুতে তাঁর মনে আনন্দ দিতে পারে না। তাঁকে নীরব দেখে সম্রাট একবার জিজ্ঞাসা করলেন—কি বন্ধু, আমার গান আগুনের এই বিরাট ধ্বংস-লীলাকে ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারছে তো?

শুষ্কস্বরে পেত্রোনিয়াস তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বললেন—তাতে কোনো সন্দেহ নেই সম্রাট! আপনার গান এই ধ্বংস-লীলারই

উপযুক্ত! আর এ ধ্বংস-লীলা যে আপনারই উপযুক্ত, তাতেও কোন সন্দেহ নেই!

তাঁর কথায় যে ঘৃণা পরিস্ফুট হয়ে উঠলো, আর সকলে বুঝলেও নীরো তা বুঝলেন না। অহঙ্কারের মোহে তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি আচ্ছন্ন!

মৃত্যুর এ অগ্নি-লীলা তখন নীরোর মনকে উত্তেজিত করে তুলেছে কবিতায়! নীরো আপন-মনে আনন্দে গান গেয়ে চলেছেন।

দূরে অকস্মাৎ জেগে উঠলো ভীষণ কোলাহল।

প্রথমে কেউ কর্ণপাত করলো না সে-কোলাহলে। কিন্তু দূর থেকে কোলাহল যেন ক্রমশঃ নিকটে আসছে। কূল-ভাঙ্গা মহাসাগরের গর্জ্জন যেন—শত-সহস্র সর্ব্বহারা লোকের ক্রুদ্ধ অন্তিম প্রতিবাদ! তখন আর সেদিকে উদাসীন থাকা সম্ভব হলো না কারও। প্রিটোরিয়ান গার্ডদের ডেকে তাইজেলিনাস প্রশ্ন করলেন,—কিসের গোলমাল? উত্তর এলো—নাগরিকরা প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারা চীৎকার করে বলছে, নীরোই আগুন দিয়েছেন নগরে! নীরোকে ওরা সিংহাসন থেকে টেনে নামাবে—নীরোকে ওরা হত্যা করবে!

সঙ্গীতের আনন্দে বিভোর হলেও এ-কথা নীরোর কাণে ঠিক প্রবেশ করলো। প্রথমে আতঙ্কে অবসন্ন হলেন—পরক্ষণে গর্জ্জন তুললেন প্রকৃতিগত দম্ভে—পশু-গুলো কী সাহসে আমার প্রাসাদের কাছে এসে চীৎকার করে?

—সাহসে নয় সীজার, প্রয়োজনের তাড়নায়। ওরা বাঁচতে চায় সম্রাট। উত্তর দিলেন পেত্রোনিয়াস।

—বাঁচতে চায়? কে বলেছে ওদের বাঁচতে?

—কেউ বলেনি—তবু ওরা বাঁচতে চায়। সীজারের আপত্তি থাকলেও ওরা বাঁচতে চায়। ওদের ঘর নেই, খাবার নেই, পরিধানে বসন নেই। সর্ব্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে আপনার এই লীলা-সুখের আগুনে। ঐ শুনুন, ওরা চীৎকার করছে—ঘরপোড়া ঘরপোড়া বলে! আপনাকেই ওরা দিয়েছে এই উপাধি! এমন মরিয়া হয়েছে যে সম্রাটের যোগ্য মর্য্যাদা দিতে ওরা আর পারছে না।

—গার্ডগুলো করছে কী? অস্ত্র চালিয়ে ওদের দূর করে দিচ্ছে না কেন?

তাইজেলিনাস ছুটে গেলেন জনতার উপর প্রিটোরিয়ানদের লেলিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু তাঁকে আহত হয়ে ফিরে আসতে হলো। হাজার-হাজার লোক প্রাসাদের প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েছে। তাদের হাতে লাঠি আর ঢিল। পাথরের চাঙড় লেগে মাথা ভেঙ্গে গেছে তাইজেলিনাসের। রক্ত মুছতে-মুছতে তিনি এসে নীরোকে জানালেন—নাগরিকদের নিরস্ত করতে না পারলে এখনই তারা প্রাসাদ অধিকার করবে! তা যদি করে, তাহলে সম্রাটের জীবন নিরাপদ থাকবে না।

এই সময়ে পম্পিয়া এসে এক পরামর্শ দিলেন। সে পরামর্শ কোন মানবীর মাথা থেকে বেরুতো না। আকারে মানবী হলেও স্বভাবে দানবী—নীরোর এই সুন্দরী মহিষী। তাই দানবীর যোগ্য উপদেশ দিলেন তিনি—

—নাগরিকরা বলছে, সম্রাট তাদের নগর পুড়িয়ে দিয়েছেন। কথাটা ষোল-আনা মিথ্যা নয়, কারণ আগুন যদিও তাইজেলিনাস

দিয়েছেন, আগুন দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন নীরো! সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তারা এসে সম্রাটকে হত্যা করবে, এ হতে পারে না। কাজেই আগুন লাগানোর দায় অন্য-কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াই এখন দরকার! ঐ খৃষ্টানদের উপর নাগরিকরা বিরক্ত। তাই ওদের ঘাড়ে এ দোষ চাপিয়ে দেওয়া যায় যদি, কেউ তা অবিশ্বাস করবে না!

সম্রাজ্ঞীর এ উপদেশ সকলে শিরোধার্য্য করলেন। নীরো তখনই ঘোষণা জানালেন, এ অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী খৃষ্টানরা। এবং এর জন্য তাদের এমন ব্যাপক সাজা দেওয়া হবে যে খৃষ্টানদের চিহ্ন রোমে আর থাকবে না।



নয়

নিরপরাধ খৃষ্টানদের মাথায় নীরোর খড়গ উদ্যত হলো এইবার। ঘোষকের দল সারা দেশে প্রচার করে দিলো সীজারের ঘোষণা—রোম-নগরে আগুন দিয়েছে ঐ খৃষ্টানরা। দেবদ্বেষী, সাম্রাজ্যের এবং সভ্যতার শত্রু ঐ খৃষ্টানদের সমূলে ধ্বংস করবেন নীরো। রোমানদের চোখের সামনে হিংস্র পশুদের মুখে ঐ খৃষ্টানদের ফেলে দেওয়া হবে। সেই হবে ওদের যোগ্য শাস্তি! আর ওদের জন্য যে-সব রোমান সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে, ওদের মৃত্যু দেখে তারা পাবে শান্তি!

সম্রাটের আদেশে দলে দলে খৃষ্টানরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। তাদের ধরে আনা মোটে শক্ত হলো না। আগে বরং তারা গোপনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করতো। কিন্তু রোমে পিটারের আগমনের পর থেকে তারা যে-কোন নিভৃত স্থানে সমবেত হয়ে পিটারের বক্তৃতা শুনতো, পলের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতো একান্ত নির্ভয়ে। তাদের একান্ত বিশ্বাস—দুঃখের ভিতর দিয়েই শক্তি আসে, শান্তি আসে! প্রভু যীশু স্বয়ং ক্রশে বিদ্ধ হয়েছিলেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য। তাঁর ভক্তেরা সামান্য নির্য্যাতনে ভয় পাবে কেন?

দেখতে দেখতে কারাগার ভর্ত্তি হয়ে উঠলো। ছোট বড় পদস্থ নগণ্য কোন খৃষ্টানই আর বাদ রইলো না! লিজিয়া, নাজারিয়াস এবং আর্শাসকে নিয়ে প্লতিয়াসের গৃহে পৌঁছে দিয়েছিলেন মার্কাস—আশ্বাস দিয়েছিলেন, প্রথম সুযোগেই তিনি সবাইকে নিয়ে সিসিলি যাত্রা করবেন—রোম আর এখন খৃষ্টানদের পক্ষে নিরাপদ নয়।

কিন্তু সে-সুযোগ মার্কাস আর পেলেন না! নীরোর কঠোর আদেশ —কোন খৃষ্টানকেই রেহাই দেওয়া হবে না! প্লতিয়াসের গৃহও একদিন ঘিরে ফেললো প্রিটোরিয়ান গার্ডরা। তাইজেলিনাসের আদেশে প্লতিয়াস সপরিবারে বন্দী হলেন। লিজিয়া, আর্শাস—কেউ বাদ রইলো না। একমাত্র নাজারিয়াস তখন পিটারের কাছে ছিল—সে রয়ে গেল কারাগারের বাইরে।

পেত্রোনিয়াসের গৃহে বসে মার্কাস এ সংবাদ শুনে ক্ষোভে দুঃখে উন্মাদ হয়ে উঠলেন! তিনি সাক্ষাৎ করলেন তাঁর ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মী ফেবিয়াস আর জাষ্টিনের সঙ্গে, যাঁরা গল আর ব্রিটেনের অভিযানে তাঁর দক্ষিণ এবং বাম হস্ত-স্বরূপ ছিলেন।

তিন বন্ধু পরামর্শে স্থির করলেন—রোমকে এই দানব নীরোর অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে না পারলে রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে! নীরোর পাপের অন্ত নেই! মাতৃহন্তা, স্ত্রীহন্তা এই নীরো! রোমকে সে ভস্মস্তূপে পরিণত করেছে। এখন সমগ্র খৃষ্টান সম্প্রদায়কে নির্মূল করবার জন্য ক্ষেপেছে! এর পর ও শয়তানের মাথায় আবার কি নতুন সর্ব্বনাশা ফন্দীর উদয় হয়, কে জানে! ওর রাজত্বে কারও জীবন নিরাপদ নয়!

কিন্তু ওকে সিংহাসনচ্যুত করতে হলে সামরিক শক্তির প্রয়োজন। মার্কাসের গল-ব্রিটেন-জয়ী বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তিনি নিজে কিছু করতে পারেন না! তাই তিনি প্রস্তাব করলেন, টাস্‌কানিতে দূত পাঠিয়ে সেনাপতি গাল্‌বাকে ডেকে আনা হোক। তিনি সেনাপতি হিসাবে যশস্বী—তার উপর মানুষ-হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট



যোবিয়াসকে নিয়ে মার্কাস···প্লতিয়াসের ভিলায়

[ছবি—মেট্রো গোল্ডউইনের সৌজন্যে



দুহাতে চেপে ধরলো ষাঁড়ের দুটো শিং

সুনাম আছে। তিনি বলীয়ান, ন্যায়-ধর্ম্মে আস্থাবান, তাঁর শাসনে রোম শান্তিতে থাকবে। গাল্‌বা আসুন, এসে নীরোকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে সম্রাট্ হয়ে বসুন!

গাল্‌বাকে যে পত্র লেখা হলো, তাতে স্বাক্ষর রইলো চার-জনের—মার্কাস, ফেবিয়াস, জাষ্টিন—সেই সঙ্গে স্বাক্ষর হইলো পেত্রোনিয়াসের। নীরোকে তিনি প্রকৃতই ভালোবাসতেন এক সময়, কিন্তু তাঁর অত্যাচার অনাচার যেভাবে মাত্রা ছাড়িয়ে চলেছে, তাতে তাঁর শাসনের যাতে অবসান হয়, সেই চেষ্টাই এখন প্রত্যেক রোমবাসীর কর্ত্তব্য বলে তিনি মনে করেন।

গাল্‌বার কাছে পত্র নিয়ে ফেবিয়াস নিজে গেলেন।

এদিকে লিজিয়াকে কারামুক্ত করবার জন্য সম্ভব-অসম্ভব সব রকম চেষ্টা করলেন মার্কাস আর পেত্রোনিয়াস। তাইজেলিনাস সে খবর পেলেন এবং কারাগারের সম্মুখে এক সময়ে মার্কাসকে দেখতে পেয়ে সৈনিকদের সাহায্যে তিনি তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। খৃষ্টানদের বন্ধু বলে তাঁকেও নিক্ষেপ করা হলো খৃষ্টানদের দলে।

শাপে বর হলো মার্কাসের! কারাগারে তিনি দেখা পেলেন লিজিয়ার। সেখানে লিজিয়ার সাহচর্য্যে তাঁর দিন কাটতে লাগলো। আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে খৃষ্টানদের ধৈর্য্য—আর ধর্ম্মবিশ্বাস এখনো এমন অটল দেখে তিনি প্রথমে হলেন বিস্মিত! তারপর হলেন মুগ্ধ! কোথা থেকে পায় এরা এতখানি মনের বল?

মার্কাস অবাক হয়ে ভাবেন। এ তো অস্বীকার করা চলে না!

গম্ভীরভাবে খৃষ্ট-ধর্ম্মের তত্ত্বের সন্ধান নেবার চেষ্টা করেন। যত গভীর ভাবে চিন্তা করেন, ততই মনে এক নূতন চেতনার দীপ্তি ফুটে উঠতে থাকে! যে-মানুষ হাসিমুখে ক্রশে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁর বীরত্ব কতখানি, সেই মৃত্যুমগ্ন কারার অন্ধকারে তা বিদ্যুৎঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মার্কাসের অন্তরে। প্রভু যীশুর উপর তাঁর ভক্তি প্রগাঢ় হয়ে উঠলো। সিংহের মুখে নিক্ষিপ্ত হবার আগে মার্কাস সত্যধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন—লিজিয়া তা দেখে যেতে পারবে না!

এদিকে রোম নগরে বা তার উপকণ্ঠে কোথাও আর একটি খৃষ্টান কারাগারের বাইরে রইলো না—পিটার আর নাজারিয়াস ছাড়া। পিটার কেন এতদিন ধরা পড়েন নি, সে এক বিস্ময়! পালিয়ে বেড়াবার মানুষ তিনি নন। প্রকাশ্যে তিনি বিচরণ করছেন, শূন্য প্রান্তরে দাঁড়িয়ে তিনি ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন, কেউ তাঁকে বন্দী করে নি এখনো! এক-এক সময় তিনি নিজেই এতে আশ্চর্য্য বোধ করেন!

প্রভু যীশুকেও শয়তান এক সময় প্রলোভন দেখিয়েছিল। পিটারের মনে হলো—এই তো রোম আজ খৃষ্টান-শূন্য। এখানে থেকে আমার লাভ? ইট-কাঠকে ধর্ম্মোপদেশ দেবো? নূতন কেউ এ-সময়ে সাহস করে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষা নেবে, এমন সম্ভাবনা মোটে নেই! কাজেই রোম ছেড়ে অন্য স্থানে যাওয়াই এখন আমার পক্ষে উচিত হবে। পৃথিবীর অন্য সব দেশও প্রভুর বাণী শুনতে চায়!

প্রলোভন এমন জিনিষ! মনের দুর্ব্বলতা কুযুক্তিকে মনোহর করে রাঙিয়ে তোলে! খৃষ্টানদের কাছে রোম এখন শ্মশান ছাড়া

আর কিছু নয়। পিটার তা জানেন। এ শ্মশান ত্যাগ করে পালাবার জন্যে পিটারের মন কখন আকুল হয়ে উঠেছে—পিটার বুঝতে পারেন নি! নির্য্যাতনের জন্য রোম ত্যাগ করা উচিত হবে না, তবু একদিন শেষ-রাত্রে তিনি রোম ত্যাগ করলেন—সঙ্গে শুধু বালক নাজারিয়াস।

রোম ত্যাগ করে চলেছেন পিটার। পিছনে রইলো হাজার হাজার খৃষ্টান কারাগারে আবদ্ধ হয়ে···সিংহ-ব্যাঘ্রের মুখে নিক্ষিপ্ত হবার অপেক্ষায়! এতদিনে নিক্ষিপ্ত হতো—হয়নি তার কারণ, রোমে এত সিংহ-ব্যাঘ্র নেই? সিংহ-ব্যাঘ্রের জন্য সম্রাটের আদেশে বহু লোক আফ্রিকার ঘন অরণ্যে, মরুপ্রান্তরে গিয়েছে···তারা ধরে আনবে তাজা বুনো সব সিংহ-ব্যাঘ্র। আনবামাত্র সেই সব সিংহ-ব্যাঘ্রের মুখে বন্দী খৃষ্টানদের নিক্ষেপ করা হবে।

ওদিকে রোম ত্যাগ করে চলেছেন পিটার তাঁর শিষ্যদের নিয়তির গ্রাসে ফেলে রেখে। বাতাস বইছে মৃদুমন্দ, নীল-আকাশ লক্ষ নক্ষত্রের চক্ষু মেলে তাকিয়ে দেখছে মহাপুরুষের পদস্খলন! পিটার চলেছেন —অন্তরে বুঝি অস্বস্তি জেগেছে! অস্বস্তি এবং গ্লানি! প্রভু যীশু জীবিত থাকলে তিনি কি এভাবে পালাতেন? জেরুসালেমের সেই শেষ দিনগুলির কথা পিটারের মনে পড়ে। ইহুদীরা তাঁকে ধরবে, তাঁকে হত্যা করবে—এ কি তিনি জানতেন না? কিন্তু জেনেও তিনি পালান নি! মৃত্যু বরণ করে তবেই মানবজাতির চিত্ত লাভ করা যায়, এ-সত্য তিনি নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গিয়েছেন! আর পিটার আজ কি করছেন? প্রাণ নিয়ে তিনি পালিয়ে যাচ্ছেন খৃষ্টধর্ম্মকে কলঙ্কিত করে!

অকস্মাৎ পূর্ব্বাকাশে আলোর ঝলক জেগে উঠলো! পিটার অবাক হয়ে সেই আলোর দিকে চেয়ে থাকেন!

পিটার ভাবলেন, এরি মধ্যে রাত্রি প্রভাত হলো?

কিন্তু কী আশ্চর্য্য! ও আলো সূর্য্যের নয়! সূর্য্য আকাশের ঊর্দ্ধ-পথে আরোহণ করে। এ-আলো নীচে নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে! অচঞ্চল দিব্য জ্যোতি চারিদিকে বিকীর্ণ করে নেমে আসছে এক মহাজ্যোতি! বিস্ময় বিমুগ্ধ নয়নে পিটার দেখেন, সেই দিব্য জ্যোতি পৃথিবী স্পর্শ করলো অবশেষে, ক্রমশঃ এগিয়ে এলো পিটারের দিকে।

পিটার স্থির লক্ষ্যে তাকিয়ে আছেন সেই আলোর দিকে। তাঁর মুখে-চোখে স্তম্ভিত ভাব! মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে ভয়ে বিস্ময়ে। ক্রমে সে জ্যোতি সম্মুখে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো! পিটারের পাশে নাজারিয়াস। সে এই আশ্চর্য্য আলোর রহস্য বুঝতে না পেরে পিটারের দিকে চায় ভয়ে-ভয়ে। বিস্মিত হয়ে সে দেখে, পিটারের মুখে ক্রমশঃ ফুটে উঠছে গভীর আনন্দের আভাস! এ আলো যেখান থেকেই আসুক, এতে আনন্দ পাবার কী থাকতে পারে, বালক নাজারিয়াস তা বুঝতে পারলো না। সে জ্যোতিতে অনেকখানি আলো ছাড়া আর কিছু সে দেখতে পায় না।

সেই স্থির জ্যোতির সম্মুখে মাটিতে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে যখন প্রণাম করলেন ধর্ম্মগুরু পিটার, তার বিস্ময় একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেল! প্রভু কাকে প্রণাম করছেন? কোন মূর্ত্তি ও-আলোর ভিতরে নাজারিয়াস তো দেখতে পাচ্ছে না!

তারপর তাকে একেবারে হতচকিত করে পিটার কোন্ অদৃশ্য

সত্তাকে উদ্দেশ করে বিনীত আর্দ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—ক্যুয়ো ভাদিস্ ডোমিনি ?—হে প্রভু, আপনি কোথায় চলেছেন ?

নাজারিয়াস কিন্তু কিছু শুনতে পেলো না। পিটার স্পষ্ট শুনলেন, সেই জ্যোতির বাণী ! জ্যোতি বলছেন—আমি রোমে যাচ্ছি পিটার ! আমার পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তোমার উপর। তুমি যখন তাদের বিপদের মুখে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছো, তখন আমি চলেছি রোমে—দ্বিতীয়বার আমি হবো ক্রশবিদ্ধ।

পিটারের মুখে শুধু আর্ত্তস্বর—হে খৃষ্ট ! হে খৃষ্ট ! হে প্রভু !

পিটার উঠে দাঁড়ালেন। সে-দিব্যজ্যোতি তখন অন্তর্হিত হয়েছে। নিশাশেষের তরল অন্ধকারে আকাশ-পৃথিবী আচ্ছন্ন। নীল আকাশের লক্ষ নক্ষত্র-চক্ষু এবার পিটারের দিকে তাকিয়ে পরম আশ্বাস বিকিরণ করছে স্নিগ্ধ মৃদু আলোক-ছটায় ! পিটার উঠে দাঁড়িয়ে ভূপতিত দণ্ড হাতে তুলে নিলেন। অত্যন্ত লজ্জিত হলেন ! বুঝতে পারলেন, কত বড় ভুল তিনি করছিলেন ! আজ তাঁর কি সৌভাগ্য, স্বয়ং প্রভু এসে তাঁর সে-ভুল ভেঙ্গে দিয়ে গেলেন ! এক অজেয় শক্তিতে পূর্ণ হলো পিটারের দেহ-মন। তিনি রোমের দিকে ফিরে চললেন।

পিটারের মুখে একটু আগে যে প্রশ্ন নিঃসৃত হয়েছিল, বালক নাজারিয়াস এখন সেই প্রশ্নই পিটারকে করলো—ক্যুয়ো ভাদিস্ ডোমিনি ? হে প্রভু, আপনি কোথায় চলেছেন ? পিটার একটু আগে যে-উত্তর কাণে শুনেছেন, এ-প্রশ্নের সেই উত্তর তিনি নাজারিয়াসকে দিলেন—আমি রোমে যাচ্ছি।

* * * *

রোমে প্রবেশ করে প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে প্রচার করতে লাগলেন পিটার। নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, মৃত্যুর মধ্যে আমি নিয়ে এসেছি অমৃত, বেদনার মধ্যে সান্ত্বনা, নিয়ে এসেছি খৃষ্টের বাণী! দলে দলে লোক এসে তাঁর কাছে নবধর্ম্মে দীক্ষা নিতে লাগলো। তখন খৃষ্টান হলেই নীরোর হাতে মৃত্যু নিশ্চিত! এ-কথা জেনেও অসংখ্য লোক ঘিরে ধরলো পিটারকে সত্যধর্ম্মের আশ্রয় পাবার জন্য।

খবরটা তাইজেলিনাসের কাণে যেতেই সে এসে পিটারকে ধরলো —ধরে বন্দী করে নিয়ে গেল।

হাসি-মুখে উন্নতশিরে পিটার কারাগারে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে বিষাদ-পুরীতে আনন্দ জেগে উঠলো! জেগে উঠলো গভীর নৈরাশ্যের অন্ধকারে আশার রশ্মি। বন্দী খৃষ্টানরা তাঁর সম্মুখে এসে কেউ কর-চুম্বন, কেউ চরণ-চুম্বন, কেউ তাঁর বসনপ্রান্ত চুম্বন করতে লাগলো। যেন কতকাল পরে হারানিধির সন্ধান পেয়েছে তারা! পিটার যেন তাদের হাতে দেবেন সেই পরশমণি—যার স্পর্শে মৃত্যু-বৈতরণীর আঁধার-খেয়া তারা নির্ব্বিঘ্নে পার হতে পারবে!

আফ্রিকার জঙ্গল থেকে নিত্য নূতন নরখাদক সিংহ আমদানি হচ্ছে রোমে—খেলা দেখাবার পুরাতন য়্যাম্‌ফি-থিয়েটার পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল বলে নূতন য়্যাম্‌ফি-থিয়েটার গড়ে তোলা হচ্ছে হাজার হাজার নাগরিককে সে-কাজে লাগিয়ে। এ কাজে নাগরিকদের উৎসাহের সীমা নেই। দু'-চারটে মল্লের মৃত্যু তারা রঙ্গভূমিতে মাঝে মাঝে দেখে, কিন্তু এবার নীরো তাদের সম্মুখে আনন্দ পরিবেশনের

যে বিরাট আয়োজন করেছেন, তার তুলনায় আগের সে সব খেলা একান্ত নগণ্য ! হাজার হাজার খৃষ্টানকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে সিংহের দল—কি অপরূপ তামাসা ! নীরোর সকল অত্যাচার বিস্মৃত হয়ে গেল রোমের লোক। মনে-প্রাণে এখন তাদের বিশ্বাস, তাদের চিরদিনের বন্ধু নীরো ! তাদের শত্রু যদি কেউ থাকে তো সে-ঐ বিধর্ম্মী খৃষ্টানরা !

নাগরিকদের উল্লাসের বা অভিশাপের কোন খবর না রেখে খৃষ্টানরা কারাগারে বসে যীশুর মহিমা কীর্ত্তন করে চলে। পিটার ধর্ম্মের কথা বলছেন, প্রেমের বাণী শোনাচ্ছেন। দূরাগত সঙ্গীতের মত তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে যীশুর অমর বাণী,—তারাই ধন্য, যারা ভগবানে বিশ্বাস রাখে !

এই সময়ে লিজিয়া মার্কাসের হাত ধরে পিটারের সামনে এসে দাঁড়ালো। হাসিমুখে লিজিয়া বললে—মার্কাসকে দীক্ষা দিন—আর দীক্ষার পর এই কারাগারেই আমাদের বিবাহ দিন।

কারাগারে আনন্দের হাট বসে গেল ! বন্দীশালায় আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় মার্কাসের দীক্ষা এবং লিজিয়ার সঙ্গে তার বিবাহ ! দু'টিই পিটারের পুণ্য-জীবনের শেষ কাজ !

পরের দিন তাইজেলিনাসের লোকেরা এসে পিটারকে কারাগার থেকে নিয়ে গেল। আটিকাস পাহাড়ের উপর তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে রাখলো তারা।

যতক্ষণ না মৃত্যু এলো পিটারের আত্মাকে নিয়ে যাবার জন্য, ক্রুশবিদ্ধ পিটার ততক্ষণ একাগ্রভাবে খৃষ্টধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করতে লাগলেন, আর মন্ত্র-মুগ্ধের মত রোমের অগণ্য নাগরিক সামনে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো মৃত্যু-পথযাত্রীর মুখে সেই অমৃত-বাণী !

দশ

নীরোর মনে শান্তি নেই! তার কারণ, রোমে নানা আজগুবি গুজব শোনা যাচ্ছে—টাস্‌কানি থেকে সেনাপতি গাল্‌বা নাকি সসৈন্যে রোমে আসছেন। অথচ তাঁকে আসবার জন্য সীজার তো কোন আদেশ পাঠান নি! এর একটিমাত্র অর্থ হতে পারে। সে অর্থ—গাল্‌বা বিদ্রোহ করতে চান!

তা করুন, নীরো তাতে ভয় পান না। ইতালীর নানা জায়গায়, দুর্গে দুর্গে তাঁর সৈন্য মজুত। তাদের অতিক্রম করে রোম পর্য্যন্ত পৌঁছানো গাল্‌বার পক্ষে সম্ভব হবে না। তারপর গাল্‌বা রোমে যদি এসে পড়ে, তাতেই বা ভয় কি? ষোল হাজার প্রিটোরিয়ান গার্ড রয়েছে নীরোকে ঘিরে। তারা জনে জনে দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। তার উপর আছে রোমের রাজভক্ত নাগরিকরা। খৃষ্টানমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান তাদেরই তৃপ্ত করবার জন্য! খৃষ্টানদের শাস্তি যখন তারা চোখের সামনে দেখবে, তখন বুঝবে, তাদের জন্য সম্রাটের কত দরদ। তখন খুশী হয়ে তারা তাদের সম্রাটকে সাহায্য করবে!

না, গাল্‌বার জন্য নীরোর ভয় নয়। তাঁর ভয় শুধু বিশ্বাসঘাতকদের—তাঁর পাশেই তারা রয়েছে। বন্ধুর ছদ্মবেশ ধরে—সব চেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু। তাদের প্রধান ঐ পেত্রোনিয়াস। রোমে আগুন লাগার পর থেকেই পেত্রোনিয়াস সম্রাটের সান্নিধ্য বর্জ্জন করে চলেছেন। দেখা হলেও আর আগের মত সম্ভ্রম করে কথা বলেন না! এখন তাঁর কথায় ব্যঙ্গ, ভৎ‌র্সনা, এমন কি রাজদ্রোহের সুস্পষ্ট

আভাস! সুতরাং পেত্রোনিয়াসকে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। গাল্‌বা এসে পড়ার পূর্ব্বেই ঘরের শত্রু বিভীষণদের নির্ম্মূল করতে চান নীরো!

পারিষদ-মহলে পেত্রোনিয়াসের যাঁরা অনুরক্ত ছিলেন, তাঁরা কেউ কেউ এসে অতি গোপনে সংবাদ দিয়ে গেলেন—প্রস্তুত হও, বন্ধু! অচিরে সম্রাটের দূত আসবে তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে।

পেত্রোনিয়াস তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে হাসিমুখে বললেন—আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত! নীরোর সঙ্গে এক-পৃথিবীতে বাস করে যে পাপ করেছি, আমি চাই তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে!

বন্ধুদের মুখে সংবাদ না পেলেও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি পেত্রোনিয়াসের বুঝতে বাকী রইলো না, তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে! পালিয়ে অবশ্য প্রাণ বাঁচাতে পারা যায়! কিন্তু পালিয়ে কোথায় যাবেন? যেখানে যাবেন, কষ্ট পেতে হবে। পেত্রোনিয়াস বিলাসী মানুষ। রোমের বাইরে বিলাসের উপকরণ মিলবে কোথায়? একমাত্র সিসিলিতে পাওয়া যেতো মার্কাস সেখানে থাকলে। কিন্তু মার্কাস কারাগারে! সুতরাং পেত্রোনিয়াসকে মরতে হবে। নির্ব্বাসনে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে নিজের প্রাসাদে সুখ-শয্যায় মৃত্যু-বরণ করা ঢের ভালো!

পেত্রোনিয়াস এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন, বন্ধুদের আমন্ত্রণ করে পাঠালেন! সেই বিরাট ভোজের সম্ভাবনায় বন্ধুরা লুব্ধ হয়ে উঠলেন! তাঁরা জানতেন, পেত্রোনিয়াসের বাড়ীর ভোজ—সে-ভোজ যে সম্রাট্-প্রাসাদের ভোজের চেয়ে ঢের বেশী আনন্দদায়ক! সুস্বাদু ভোজ্য-পানীয়ের সঙ্গে এখানে মেলে সুরুচির পরিচয়, যা নীরোর ভোজে পাওয়া যায় না। এখানে দেখা যায় রোমক

সভ্যতার সুন্দরতম প্রকাশ—কাব্যে, সঙ্গীতে, রসিকতায়, কারুশিল্পের অনিন্দ্য রূপায়নে! আর নীরোর প্রাসাদে? রোমান সভ্যতার বিকৃত রূপ চোখে পড়ে আহারে বিহারে আলাপে আপ্যায়নে! গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ব্যভিচার, আতিথ্যের মাঝে অনাচার এবং সরলতা আর আন্তরিকতার উপর নির্ম্মম পীড়ন। সেখানে অতিথিদের মনে সর্ব্বক্ষণ আতঙ্ক—কখন আর কিসে নীরোর অসন্তোষ ঘটে! অমনি কাঁধের উপর থেকে মাথা যাবে খশে!

পেত্রোনিয়াসের বাড়ীতে পূর্ব্বে বহু ভোজ হয়ে গেছে, কিন্তু আজকের এ আনন্দোৎসব আগের অনুষ্ঠানকেও মলিন করে দিয়েছে যেন! আলোর ঝর্ণা ঝরছে প্রাসাদ-উদ্যানে। কোথা থেকে অজানা কত ফুলের গন্ধ আসে—বোঝা যায় না! নৃত্যের জন্য স্পেন থেকে বাছাই-করা সুন্দরীদের নিয়ে আসা হয়েছে। সুবেশা কিশোরীরা সুরাপাত্র নিয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করছে, দেব-সভায় কিন্নরীর মত। ভোজন-কক্ষে মখমলের গদিতে অর্দ্ধশয়ান পেত্রোনিয়াস হাসিমুখে নানা আলোচনা করছেন বন্ধুদের সঙ্গে। রাজনীতির কথা, সম্রাজ্ঞীর চিতা বাঘের কথা, এমন কি আসন্ন খৃষ্টান-মেধের জমকালো উদ্যোগ-আয়োজনের কথা। সে অনুষ্ঠানের সঙ্গে যে তাঁর নিজের ভাগিনেয় মার্কাসও সাংঘাতিক ভাবে জড়িত, তা যেন তিনি ভুলে গিয়েছেন! অথচ দেবরাজ জুপিটার জানেন—মার্কাসের কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভোলেন নি পেত্রোনিয়াস। জীবনে আত্মীয় বলে কাকেও যদি তিনি ভালোবেসে থাকেন, তো সে এই মার্কাসকে!

সম্রাটের পারিষদদের মধ্যে অনেকেই সেখানে ছিলেন। তাঁরা

জানেন, নীরো সম্প্রতি বিশেষ বিরূপ হয়েছেন পেত্রোনিয়াসের উপর। এ জেনেও পেত্রোনিয়াসকে এমন হাস্যে-গানে উৎফুল্ল দেখবার আশা তাঁরা করেন নি। কাজেই তাঁরা ভাবছেন, মেঘ কেটে যাবে, এমন আভাস পেত্রোনিয়াস নিশ্চয় পেয়েছেন! না হলে এত আনন্দ মনে আসে কি করে!

এমন মনোমালিন্য আগেও দু'-চারবার হয়েছে সম্রাট্ আর পেত্রোনিয়াসের মধ্যে। সুকৌশলে সে-সব সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি পেত্রোনিয়াস এবং সঙ্কট অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পেত্রোনিয়াসের উপর নীরোর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে আগের চেয়েও অজস্র-ধারায়! সুতরাং সেনেকা-প্রমুখ পারিষদদের সন্দেহ নেই যে মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত পেত্রোনিয়াস আবার রোমের আকাশে উদিত হবেন অচিরে এবং দ্বিগুণ তেজে!

সেনেকা মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করলেন—বহুদিন আপনি দরবারে যাননি! কবে যাচ্ছেন বলুন তো?

পেত্রোনিয়াস বেশ হাসি-মুখে জবাব দিলেন—দরবারে! না, আমি আর দরবারে যাবো না, ঠিক করেছি। নীরোর কাছে আর নয়। বিশ্বাস হচ্ছে না? কিন্তু তামাসা নয়—সত্যই যাবো না। এই দেখুন চিঠি লিখেছি। আমার বিদায়-লিপি। এখনো পাঠানো হয়নি। তার কারণ, ভাবছি, আপনাদের মত কোনো বন্ধু যদি দয়া করে চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে সম্রাটের হাতে দেন! এ-চিঠিতে কি লিখেছি, পড়ি, শুনুন—এই বলে পেত্রোনিয়াস পড়তে আরম্ভ করলেন,—

—রোমবাসীদের ভাগ্য-বিধাতা নীরো! অমিত-প্রতাপ সীজার!

শুনছি, আমার জন্য আপনি নিত্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছেন! শুনছি প্রাসাদে পদার্পণ করবামাত্র আপনি আমাকে প্রিটোরিয়ান গার্ড-দলের অধিনায়কের আসন দেবেন। ও-আসন আমাকে না দেওয়া ছাড়া আপনার উপায়ও নেই। কারণ, বর্ত্তমান অধিনায়ক তাইজেলিনাসের জন্ম হয়েছিল কসাইগিরি করবার জন্য! বিলম্ব হলেও এখনও তাঁর সেই কাজে গিয়ে যোগ দেওয়া উচিত।

—কিন্তু যত অধীর হয়েই আপনি আমার প্রতীক্ষা করুন না কেন, আমি আর আসবো না। যে ভূতপূর্ব্ব সম্রাট ডোমিটিয়াসকে আপনি বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেছিলেন, যে জননী আগ্রিপিনার বুকে আপনি ছোরা বসিয়েছিলেন, যে ধর্ম্মপত্নী অক্টেভিয়ার দম বন্ধ করে দিয়েছিলেন ঘরে গরম বাষ্পের পাইপ খুলে দিয়ে, তাঁদের সকলের নাম করে আমি বলছি—আপনার কাছে আমি আর যাবো না!

—জীবনে অনেক সুখ, স্বীকার করি। সে-সব সুখ আমি পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করেছি। কিন্তু দুঃখও পেয়েছি প্রচুর। সে দুঃখের কারণ আর কেউ নয়, আপনি! আপনার কদর্য্য আচরণে এ দুঃখ নয়! আপনার ভ্রাতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা বা অন্য শতশত ধর্ম্মপ্রাণ সম্ভ্রান্ত লোকের নির্ম্মম হত্যার জন্য আমার এ দুঃখ, তাও মনে করবেন না। রোম নগরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তাকে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত করেছেন বলেও আমি আপনার উপর বিরক্ত নই। সে সব আপনার নিজস্ব ব্যাপার। তার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই।

—আমার বিরাগের কারণ তাহলে বলি। সারা জীবন আমি অশান্তি ভোগ করেছি—জ্বালাতন হয়েছি আপনার কবিতা শুনে শুনে।

আপনার গান হলো গর্দ্দভের সঙ্গীত! তা আমি আর বরদাস্ত করতে পারছি না। কাজেই আমি আর যাবো না আপনার কাছে। তাই চিরদিনের জন্য বিদায় নিচ্ছি। বিদায়-বেলায় শেষ সদুপদেশ দিয়ে যাই—আপনি আর যাই করুন, চারুকলার চর্চ্চা করবেন না আর! রোম ভস্ম হয়েছে, কিন্তু আরও বহু সমৃদ্ধ নগর আছে দুনিয়ায়, একে একে সেগুলোও জ্বালিয়ে দিন, তাতে আমার আপত্তি নেই। হাজার খৃষ্টানকে সিংহের মুখে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন, ভালোই করেছেন। প্রয়োজন বোধ করেন, ক-হাজার অখৃষ্টানকেও অ্যাম্‌ফি-থিয়েটারে ঢুকিয়ে সিংহের মুখে ফেলতে পারেন, ওসব আপনাকে মানায়। ঐ সব করতেই আপনার জন্ম। ওসব করে যান, যতদিন বাঁচেন! কেবল অনুগ্রহ করে কলা-চর্চ্চা বন্ধ করুন আপনি, এই আমার অনুরোধ! আমার অন্তিম মিনতি কবিতা লিখবেন না, গান গাইবেন না, বাঁশী বাজাবেন না।

—আমি আর যাবো না, কারণ, ওসব আমি সইতে পারি না আর। আপনার গান শোনার চাইতে যমদূতদের গর্জ্জন আমার অনেক ভালো লাগে! তার কারণ যমদূতরা আমার বন্ধু নয়। তারা বেতালা গাইলে তাতে আমার লজ্জার কারণ নেই।

এইখানে পত্র শেষ করে পেত্রোনিয়াস সেখানা সেনেকার সামনে ধরে বললেন—চিঠিখানা সীজারকে দেবেন। এতে আপনার ভয়ের কিছু নেই। কারণ, চিঠি আপনি শুনেছেন, এ কথা আপনি নিজে না বললে, নীরো জানবে না।

পেত্রোনিয়াস যখন চিঠি পড়ছিলেন, তখন ভীত, স্তম্ভিত হয়ে অতিথিরা শুনছিলেন। পড়া যখন শেষ হলো, তখন কারও মুখে কথা নেই। নীরোকে এরকম চিঠি লেখার অর্থ যে মৃত্যু, রোমের শিশুরাও তা জানে! সেনেকা হাত বাড়িয়ে চিঠি নিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—তবে কি—

পেত্রোনিয়াস তেমনি স্মিতহাস্যে জবাব দিলেন—এই মুহূর্ত্তে! স্বচক্ষে দেখে যেতে পারেন যদি ইচ্ছা হয়। দেখে যাওয়াই আপনার উচিত। যদি না যান, তাহলে আপনাদের দেবতাকে বিবরণ দেবেন কী করে?

এই কথা বলবার সঙ্গে-সঙ্গে পেত্রোনিয়াস তাঁর বাঁ হাত প্রসারিত করে দিলেন। ভোজের সুরু থেকেই এক অজানা অচেনা গ্রীক তাঁর কাছে বসেছিল। সে তার অস্ত্র বার করে পেত্রোনিয়াসের বাহুমূলের শিরা কেটে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ফোয়ারার মত বইতে লাগলো রক্তের ধারা!

হাসিমুখে পেত্রোনিয়াস শুয়ে পড়লেন।

* * * *

—পেত্রোনিয়াস মরে গিয়েছে? নীরো চীৎকার করে উঠলেন—মরার আগে আমার অনুমতি নেয়নি তো! আ-হা-হা! আমার একমাত্র বন্ধু! আ-হা-হা!

আবেগে নীরোর চোখে জল আসে! তিনি হুকুম দিলেন—স্বর্ণপাত্র আনো। আমার চোখের জল…এ-জল ধরে রাখো যত্ন করে! দেবতার অশ্রু…এর চেয়ে পবিত্র জিনিস আর নেই!

নীরোর অশ্রু ঝরতে লাগলো স্বর্ণাধারে। তিনি বললেন—পেত্রোনিয়াস যদি একবার তাঁকে জানাতো তাঁর জল্লাদ গিয়ে তার

শিরশ্ছেদ করে আসতো। নিজের হাতে কেন কষ্ট করে মরতে গেল! আহা-হা! প্রিয় বন্ধু আমার! আমার কবিতা তুমিই একমাত্র বুঝতে! এখন আর আমি কাকে শোনাবো আমার কবিতা ?

এই সময় সেনেকা ধীরে ধীরে পেত্রোনিয়াসের চিঠিখানা এগিয়ে দিলেন নীরোর দিকে!

—চিঠি? পেত্রোনিয়াসের চিঠি? আহা-হা, প্রিয় বন্ধু আমার! মরবার সময়ও আমার কথা চিন্তা করছিল! আমি মন্দির গড়ে দেবো তার নামে—তার মূর্ত্তি পূজা করবে রোমের লোক।

বলতে বলতে নীরো পত্রাবরণ ছিঁড়ে প্রথম কয়েক লাইনের উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন! সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন, যেন শত বৃশ্চিকে দংশন করেছে তাঁকে! রক্তচক্ষু দুটো যেন বেরিয়ে পড়তে চাইছে কোটর থেকে! ক্রোধে থর্থর্ করে কাঁপছেন! সীজারকে এমন ভাষায় চিঠি লিখেছে? তার হাত দুটো কেটে জিভটা টেনে উপড়ে —না, তা আর হয় না!

সে মরে গিয়েছে!

যাক, তার বাড়ীঘর আছে! পুড়িয়ে ছাই করে দাও তার সব চিহ্ন। তার দাস-দাসী আছে! তাদের জনে-জনে হত্যা কর···নারী-পুরুষ কেউ যেন বাদ না যায়!

হায় নীরো! বাড়ী পুড়িয়ে যদি কিছু শান্তি পাও! কিন্তু দাস-দাসী কেউ নেই। পেত্রোনিয়াসের প্রধান দাসী নিজের বাহুমূল ছিন্ন করে প্রভুর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছে। অন্য দাস-দাসী···মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাদের মুক্তি দিয়ে গিয়েছেন পেত্রোনিয়াস। তারা কেউ আর সে-গৃহে নেই!

এগারো

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে এলো সেই বহু-বিঘোষিত দিন।

অ্যাম্‌ফি-থিয়েটারে উৎসব সুরু হলো। খৃষ্টান-মেধ যজ্ঞ এবার অনুষ্ঠিত হবে রোম নগরে! এমন জমকালো ভাবে অনুষ্ঠিত হবে যে কোনো দর্শক জীবনে তা ভুলবে না!

কাঠ দিয়ে নূতন অ্যাম্‌ফি-থিয়েটার তৈরী করা হয়েছে নীরোর প্রাসাদের গায়ে। সম্রাটের আসন যেখানে, তার পিছনে একটা দরজা! সেই দরজা দিয়ে প্রাসাদে ঢুকে সম্রাটের খাশ-মহলে যাওয়া যায়।

ধাপে-ধাপে গ্যালারির গায়ে-গায়ে অসংখ্য আসন। প্রতি আসনে এক-একজন অভিজাত উপবিষ্ট, নারী এবং পুরুষ! উজ্জ্বল বেশভূষা! প্রদীপ্ত মুখ, রক্ত-দর্শনের প্রত্যাশায় উল্লসিত। জ্বলজ্বল করছে চক্ষু পাশবিক আনন্দের উত্তেজনায়!

আয়োজন কী বিরাট, নাগরিকরা তা কিছু কিছু পূর্ব্বেই দেখেছে। ক-সপ্তাহ ধরে নগরের পথে-পথে বিরাট চাকাওয়ালা খাঁচা চলাচল করছে—তার কোনটাতে সিংহ, কোনটাতে বাঘ! ভাল্লুক, বুনো কুকুর, বাইসন, ষাঁড়—এদেরও অভাব নেই। একটা কালো ষাঁড় এসেছে জার্মানি থেকে। গো-সমাজে সে একটা দৈত্য! হাতীর মত প্রকাণ্ড, বাঘের মত হিংস্র, গণ্ডারের মত শক্তিমান।

হাতীর দল সারবন্দী টহল করে ফিরেছে রাজপথে। পোষা, কিন্তু মাহুতের ইঙ্গিত পেলে নরহত্যা করতে প্রস্তুত। এ-সব হাতী সাধারণতঃ যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।





বামে :—গলা টিপে নিজের হাতে পপিয়াকে হত্যা করলো
দক্ষিণে :—আক্তি তাঁর হাতের উপর···নিজের হাত রেখে ছোরার চাপ দিলেন



নীরোর আমলে আদর্শ সহরের নমুনা
[ছবি—মেট্রো গোল্ডউইনের সৌজন্যে

নরঘাতী এই পশুদের বারবার দেখেছে রোমানরা। আজ দেখতে চায় খৃষ্টানদের, যাদের উৎখাত করবার জন্য এই হাজার জানোয়ারকে আনা হয়েছে আফ্রিকার অরণ্য থেকে! উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে সকলে রুদ্ধ দ্বারের দিকে—ঐ দ্বার পথ দিয়ে খৃষ্টানদের এনে ছেড়ে দেওয়া হবে রঙ্গভূমির মাঝখানে।

সে দ্বার কিন্তু বন্ধ রইলো—খুলে গেল আর একটা ছোট দরজা! এ দরজা দিয়ে মল্লরা এলো দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে! তাদের হাতে তলোয়ার, চোখে ঠুলি! কেউ কাকে চোখে দেখবে না,—যে যাকে পারে তলোয়ারের পাল্লার মধ্যে পেলে প্রাণ ভরে কুপিয়ে যাবে! এরা বেশ জানে, জীবিত কেউ এখান থেকে ফিরে যাবে না! জীবনের মূল্য বলে যা প্রাপ্য, তা এরা আগে থেকেই গুণে বুঝে নিয়েছে। সে মূল্য কেউ দিয়েছে স্ত্রী-পুত্রকে, কেউ দিয়েছে বৃদ্ধ পিতামাতাকে, আর ওদের মধ্যে যারা ক্রীতদাস, তাদের মূল্য সদাশয় সরকার মিটিয়ে দিয়েছেন তাদের প্রভুর হাতে।

মল্লদের হানাহানি চললো কিছুক্ষণ। কেউ একেবারে মরেছে, কেউ সাংঘাতিক জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। চললো এইভাবে, যতক্ষণ না শেষ মল্লটি ধরাশায়ী হলো! তখন লাল পোষাক-পরা একদল লোক এসে ঢুকলো সেখানে। তাদের হাতে ছোট ছোট খাঁড়া! তাদের কাজ, যে মল্লরা মরে নি, জখম হয়ে পড়ে আছে তাদের গলা কেটে ফেলা! দর্শকদের সামনে তারা একান্ত অবলীলায়—সেই সব জখমী অসহায় মানুষদের ঘাড়গুলো কাঠের মত কচ্‌কচ্ করে কেটে গেল! রঙ্গভূমির মাটি রক্তে রাঙা হলো···জমাট রক্তে মাটি ঢাকা পড়লো!

জল্লাদরা কাজ শেষ করে বেরিয়ে গেল। তখন সেখানে ঢুকলো কালো পোষাক পরা আর একদল লোক! তাদের কাজ দেহগুলিকে টেনে দরজার ওপিঠে নিয়ে যাওয়া! সেখানে শত শত শবাধার জমায়েৎ আছে, দেহগুলো তাতে পূরে গাড়ীতে চাপিয়ে দিলেই গড়-গড় করে গাড়ী চলে যাবে নগরের বাইরে কবর-খানায়।

দেহ সরানোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন বালি এনে সমস্ত রঙ্গভূমিতে পুরু করে ছড়িয়ে দেওয়া হলো, যাতে রক্তের দাগ একেবারে ঢেকে যায়!

এবার খৃষ্টানদের পালা! কোথায় ঘণ্টা বেজে উঠলো সঙ্কেতের!

সেই বড় কালো দরজাটা হঠাৎ গেল খুলে—আর বন্যার স্রোতের মত দলে দলে খৃষ্টান নর-নারী বেরিয়ে পড়লো রঙ্গভূমির মাঝখানে! না বেরিয়ে উপায় নেই—রক্ষীরা পিছন থেকে চাবুক মেরে সবাইকে বার করে দিচ্ছে!

তারা এসেই রঙ্গভূমিতে জানু পেতে বসে পড়লো। তারপর সুরু করলো যীশুর উদ্দেশে বন্দনা গান। এই তাদের একমাত্র সম্বল! নীরো প্রথমে মনে করেছিলেন—জানু পেতে ওরা বুঝি তাঁর করুণা প্রার্থনা করছে! কিন্তু গানের মধ্যে যীশুর নাম শুনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন তিনি···আদেশ দিলেন—জানোয়ারগুলোকে এনে ছেড়ে দাও চট্‌পট্।

আর একটা ছোট দরজা খুলে গেল—সে দরজা দিয়ে বুনো কুকুরেরা ছুটে এলো বেরিয়ে,—ধারালো লম্বা দাঁত বার করে! বাঘের চেয়ে এরা হিংস্র, বাঘের চেয়ে নির্ম্মম। তার উপর দু'দিন এদের উপবাসী রাখা হয়েছে! এখন খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে ওরা এসে, যে যাকে

সামনে পেলো, লাফিয়ে টুঁটি কামড়ে ধরলো তার! খৃষ্টানরা বাধা দেবার চেষ্টাও করলো না! আত্মরক্ষার এতটুকু প্রয়াস করলো না! একটা আর্ত্তনাদ তুললো না তারা কেউ! একটানা স্বরে তারা বন্দনা গেয়ে চলেছে···শেষ গায়কের কণ্ঠ বিদীর্ণ হলো বুনো কুকুরের হিংস্র-দংশনে—তখন গানের শেষ।

তারপর কিছুক্ষণ চললো কুকুরদের ভোজ! হাত-পা ছিঁড়ে ছিঁড়ে উদরে পুরছে, ধারায় ধারায় বইছে উষ্ণ রক্ত—চেটে চেটে তাই খাচ্ছে পরম তৃপ্তিভরে! সুসভ্য রোমানরা গ্যালারিতে বসে তামাসা দেখছে।

দর্শকরা কিন্তু এতেও তৃপ্তি পেলো না। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, এই খৃষ্টানরা এত ভীরু, এমন নিরীহ! দু-পক্ষে যদি যুদ্ধই না হলো, তা হলে কী দেখে মানুষ আনন্দ পাবে? কিন্তু ওদের তো যুদ্ধ করতে বাধ্য করা যায় না! মরতে এসেছে, যদি আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করতে না চায়, তাদের উপর সম্রাটের শাসন চলে না!

কুকুরগুলোকে উদর পূর্ণ ক'রে খাবার সুযোগ দিয়ে দর্শকরা উঠে পড়লো সেদিন! পরের দিন সিংহদের পালা! কিন্তু কালও যদি খৃষ্টানরা এই রকম করতে থাকে, তাহলে এত আয়োজন সব মাটী! লোকে আনন্দ পাবে না দেখে!

জনগণকে উত্তেজনার খোরাক জোগাবার জন্য নীরো আদেশ দিলেন—রাত্রির মধ্যেই রঙ্গভূমির চারিদিকে যতগুলি সম্ভব ক্রশকাষ্ঠ পুঁতে ফেলতে হবে আর সিংহের খেলার জন্য তার এক একটি ক্রশ-কাষ্ঠে এক এক জন পদস্থ খৃষ্টানকে বিদ্ধ করতে হবে।

প্রভাতে সম্রাট যখন আসন গ্রহণ করলেন, তখন প্রথমেই তাঁর

দৃষ্টি পড়লো সামনের একটি ক্রশকাষ্ঠের দিকে! তাতে আবদ্ধ রয়েছে এক বর্ষীয়ান পুরুষের নগ্ন দেহ। নীরো তাইজেলিনাসকে বললেন—

—ও লোকটাকে যেন চিনি-চিনি মনে হচ্ছে!

—চেনা কিছু আশ্চর্য্য নয়, দেবতা! ওর নাম প্লাতিয়াস। এক সময়ে পার্থিয়া আর গলের যুদ্ধে রোমের সৈন্য পরিচালনা করেছিল। কিছু খ্যাতিও অর্জ্জন করেছিল। ঐ লোক শেষে কিনা খৃষ্টান হয়ে গেল!

—দুনিয়ার নিয়মই এই তাইজেলিনাস!—দার্শনিক নীরো বিজ্ঞের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়েন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন—লিজিয়ার রাজার মেয়ে ওর কাছেই ছিল না?

—দেবতার অজানা কী আছে! সেই বন্দিনীর পাল্লায় পড়ে প্লাতিয়াস খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল, আবার বন্দিনীর পাল্লায় পড়েই আমাদের এক বন্ধু সেনাপতি মার্কাস ভিনিসিয়াস—

—সেও খৃষ্টান হয়েছে নাকি? তাহলে তাকে প্লাতিয়াসের পাশে ক্রশের উপর দেখছি না কেন? ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন নীরো।

—দেখবেন বৈ কি দেবতা! তবে সম্রাজ্ঞীর আদেশে তার মৃত্যু স্থগিত আছে দু-একদিন। লিজিয়া মেয়েটার যতক্ষণ না মৃত্যু হচ্ছে, সম্রাজ্ঞী ওকে বাঁচিয়ে রাখতে চান!

—এই রোমান মহিলাদের দয়া-মায়া এত বেশী তাইজেলিনাস, সেজন্য অনেক সময় শাসন-বিভ্রাট ঘটে আমাদের! এই বলে স্মিত-হাস্যে নীরো রঙ্গভূমির দিকে তাকালেন। সেখানে তখন প্রায় তিনশো জন খৃষ্টান জানু পেতে বসে যীশুর বন্দনা গান করছে। কাল যে দ্বার-

পথে বুনো কুকুরগুলোকে আনা হয়েছিল, সেখান দিয়ে বেরিয়ে এক-এক লাফে রঙ্গভূমির মাঝখানে এসে পড়েছে এক-একটা অতিকায় সিংহ!

তাদের পিঙ্গল জটা সূর্য্যকরে ঝক্ঝক্ করছে! চোখ জ্বলছে আগুনের ভাঁটার মত—পাটকিলে দেহের উপর রৌদ্রের আভা এসে ওদের এমন রাঙিয়ে তুলেছে যে এক-একটা জানোয়ারকে মনে হচ্ছে জমাট হিংসার এক-একটা জীবন্ত রক্তমাখা পাহাড়!

খৃষ্টানরা যাতে কোন রকমে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ না পায়, সেই জন্যে সিংহগুলোকে তিনদিন উপোস করিয়ে রাখা হয়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় তাদের হিংসা শতগুণ বেড়ে উঠেছে তখন। সামনে এতগুলো নধর মানুষ দেখে তারা গর্জ্জন করে উঠলো—লেজ নাড়তে থাকে অধীর আনন্দে—তারপর তীর ছোঁড়বার আগে ধনুকে যেমন টান পড়ে, সমস্ত দেহ তেমনি কিসের টানে যেন আকুঞ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু সে নিমেষের জন্য। তার পরই রৌদ্রদীপ্ত হাওয়ায় খেলতে লাগলো পিঙ্গল রঙের বিজলী-ঝিলিক! এক-একটা জানোয়ার লাফিয়ে গিয়ে পড়ছে এক-একজন মানুষের উপরে! ঐ এক কিশোরী মেয়ের টুঁটি ছিঁড়ে রক্তপান করছে বিকট এক সিংহ! ঐ আর একটা সিংহ একটা ছেলের গোটা মাথাটা মুখে পূরে কড়মড় করে চিবিয়ে খাচ্ছে, আর তার গলা থেকে বেরুচ্ছে তৃপ্তির ঘড়-ঘড় শব্দ!

রক্তোন্মাদ সিংহদের আনন্দোল্লাসের চাপা গর্জ্জন আর মৃত্যু-মথিত অসহায় মানুষদের অন্তিম চীৎকার—দুইয়ে মিলে রঙ্গভূমিকে করে তুললো নরকের চেয়ে ভয়ানক! রোমের সৃষ্টি হওয়া অবধি এমন বিপুল, এমন বিরাট নরমেধ, এমন বীভৎস হত্যালীলা আর কোন

যুগের নাগরিকরা চোখেও দেখে নি! উত্তেজনায় কেউ লাফিয়ে উঠেছে, কেউ অবসাদে নেতিয়ে পড়েছে আসনের উপর। আবার উঠে দেখছে!

সেই আর্ত্তনাদের ভেতর থেকে কিন্তু সমানে উঠে চলেছে মৃত্যু-পথযাত্রীদের কণ্ঠে যীশুর মহিমা-গান! দেহের অর্দ্ধেকটা সিংহের মুখে, বাকী অর্দ্ধেক তবু ডাকছে 'যীশু...যীশু।' ওর মধ্যে কে একজন তারস্বরে চেঁচিয়ে বললো—মৃত্যু-অন্ধকারের ওপারে ঐ দেখ শান্তি-রাজ্যের পুণ্যালোক! ঐ আগুন-বরণ পবিত্র ক্রশ! যীশু! যীশু! ত্রাণকর্ত্তা যীশু!

সঙ্গে সঙ্গে মুমূর্ষু খৃষ্টানরা ভাঙ্গা গলায় বলে উঠলো—হে ত্রাণকর্ত্তা যীশু...প্রভু!...অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যেতে এসেছো আমাদের। অসীম তোমার দয়া, প্রভু! অনন্ত তোমার মহিমা!

সেদিনকার উৎসব এইভাবে শেষ হলো। বৈকালে সম্রাজ্ঞী পম্পিয়া চললেন পশুশালা দেখতে। খৃষ্টান কিশোরী লিজিয়াকে কি করে বধ করা হবে—তার নির্দ্দেশ দেবেন তিনি। এ-ভার তিনি যেচে নিয়েছেন। তার কারণ, রোমে অসামান্যা রূপসী বলে পম্পিয়ার খ্যাতি আছে—কিন্তু লিজিয়ার রূপ দেখে সম্রাজ্ঞীর মনে জ্বলে উঠেছে উগ্র তেজে বিষের আগুন! পম্পিয়ার চেয়েও এ রূপসী! তা ছাড়া, পম্পিয়া চেয়েছিল মার্কাসকে। পম্পিয়ার গ্রাস কেড়ে নিয়েছে লিজিয়া। সুতরাং তার নিপাত চাই! লিজিয়ার জন্য পম্পিয়ার রূপের খ্যাতি ম্লান হবে? পম্পিয়াকে ছেড়ে মার্কাস যাবে লিজিয়ার কাছে?

বেছে বেছে সেই জার্ম্মান ষাঁড়টাকে ঠিক করলেন পম্পিয়া। তার

দুই শিঙের মাঝখানে হাল্‌কাভাবে বেঁধে দেওয়া হবে লিজিয়াকে—খুব হাল্‌কাভাবে, যাতে ষাঁড়ের মাথার একটি ঝাঁকুনিতে বাঁধন ছিঁড়ে লিজিয়ার দেহ মাটিতে পড়ে! তারপর আর দেখতে হবে না—দৈত্যের মত ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের শিংয়ের ঘায়ে থেঁৎলে দলা-পাকিয়ে যাবে লিজিয়ার ঐ নশ্বর দেহ···যে দেহের লোভে মার্কাসের মত বীর-পুরুষ নিজের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে খৃষ্টান হয়েছে!

সম্রাজ্ঞীর মাথায় শয়তানের বাসা! সেখানে দিন-রাত চলেছে শুধু শয়তানীর কারবার! শুধু লিজিয়াকে হত্যা করা নয়, আর্শাসকে শাস্তি দেবারও এক চমৎকার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। আর্শাস রক্ষীদের হত্যা করে লিজিয়াকে উদ্ধার করেছিল সেবারে! এবারে ষাঁড়টাকে মেরে করুক দেখি, উদ্ধার! পম্পিয়া নির্দ্দেশ দিয়েছেন—আর্শাসকে বেঁধে রঙ্গভূমিতে দাঁড় করিয়ে রেখে তার পর লিজিয়ার সামনে ষাঁড়টাকে এনে ছাড়া হবে। আর্শাস নিজের চোখে দেখবে তার রাজকন্যার মরণ!

আর মার্কাস ভিনিসিয়াস? সেই ধর্ম্মত্যাগী রোমান সেনাপতি? তার দেহ ক্রুশকাষ্ঠে লট্‌কে দেবার আগে তাকেও সুযোগ দেওয়া হবে এ-দৃশ্য দেখবার! তাকে গ্যালারিতে এনে সম্ভ্রান্ত দর্শকদের পাশে বেঁধে রাখা হবে, যাতে লিজিয়ার মৃত্যু-দৃশ্য সে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে!

বারো

তৃতীয় দিনেও রঙ্গভূমি লোকে লোকারণ্য। কিন্তু আজ যেন জনতা একটু নীরব, একটু ম্রিয়মাণ! গত দুদিন রক্তের সমুদ্র বয়ে গেছে তাদের চোখের সামনে! সে-রক্তের লোণা-গন্ধ যেন লেগে রয়েছে তাদের নাকে-মুখে···বমি আসছে যেন! পৈশাচিক খেলা দেখে যত আনন্দ পাক, মানুষের অন্তরের মনুষ্যত্ব একদিন না একদিন ফুটে বেরুতে চাইবে!

আর এক কথা! তারা, শুধু রক্তই দেখেছে···লড়াইয়ের উন্মাদনা অনুভব করতে পারে নি মোটে। তারা চিরদিন দেখে গ্লাডিয়েটরের সঙ্গে গ্লাডিয়েটরের মরণ-পণ যুদ্ধ! কখনো বা হিংস্র মানুষ দেখা দেয় হিংস্র পশুর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে, দু-পক্ষই পরস্পরকে আঘাত করে, রক্ত ঝরে দু-পক্ষের—আসন থেকে দর্শকরা কেউ বাহবা দেয় একে, কেউ বাহবা দেয় ওকে! রঙ্গভূমি ক্রমশঃ সরগরম হয়ে ওঠে। এখানে সে রকম তো কিছু হচ্ছে না! খৃষ্টানরা জানু পেতে বসে যীশুর নাম গাইছে, আত্মরক্ষা দূরে থাকুক পালাবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করছে না! এতে কি তেমন মজা হয়? দর্শকরা তাই বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

গ্যালারির উপর আজ একজন বন্দীকে স্থান দেওয়া হয়েছে, তা কেউ লক্ষ্য করেনি। করলে নিশ্চয় বিস্মিত হতো! মার্কাসকে বন্দী বলে চিনতে পারলে এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো। কারণ, বীরত্বের সম্মান রোমানরা চিরদিন করে।

কিন্তু মার্কাসকে কেউ দেখতে পেলো না। সকলের দৃষ্টি রঙ্গভূমির কেন্দ্রস্থলে। সেখানে তখন একটি মাত্র জীব দাঁড়িয়ে। যেন দৈত্য! সে আর্শাস! তাকে মল্লের বেশে সাজিয়ে রঙ্গভূমিতে এনে দাঁড় করানো হয়েছে।

রোমানরা অনেক শক্তিমান পালোয়ান দেখেছে। নিত্য নানা দেশ থেকে কত না ওস্তাদ পালোয়ান রোমে আসে—খেলা দেখিয়ে কীর্ত্তি অর্জ্জন, না হয় মৃত্যু বরণ করে। সেরা গ্লাডিয়েটরের কশরতির অনেক খেলা দেখেছে রোমানরা···কিন্তু আজ তারা যাকে দেখলো, তাকে দেখে সকলে অবাক! এমন বীরের মূর্ত্তি তারা কখনো দেখেনি। এ যেন এক পর্ব্বতশৃঙ্গ! দীর্ঘোন্নত ওক···তাও যেন মূলশুদ্ধ উপড়ে এনে কেউ বসিয়ে দিয়েছে রঙ্গভূমির মাঝখানে! মুগ্ধ-নেত্রে তাকিয়ে সকলে আর্শাসের বীর-দেহ নিরীক্ষণ করছে।

আর্শাসও অবাক হয়ে চাইছে চারিদিকে। সে জানে, তাকে সিংহের মুখে নিক্ষেপ করবার জন্য এখানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে! কিন্তু সিংহ?···কোথায় সিংহ? জনপ্রাণী নেই রঙ্গভূমিতে! সে একা। বিস্মিত দৃষ্টিতে সে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ সামনের কালো দরজা গেল খুলে। আর সেইখান দিয়ে শোনা গেল চাপা গর্জ্জন! অদ্ভুত ধরণের গর্জ্জন! সিংহের নয়, বাঘের নয়, মদমত্ত হাতীর নয়! কিসের আওয়াজ বুঝে ওঠবার আগেই একটা কালো জানোয়ার বেরুলো ছুটে সেই দ্বারপথে। এ সেই জার্ম্মানির ষাঁড়।

লোকে দেখলো—দৈত্যের সামনে আর এক দৈত্য দাঁড়িয়েছে··· মানুষের মধ্যে আর্শাস যেমন দৈত্যের মত অতিকায়, জানোয়ারের মধ্যে এই ষাঁড়টাও তেমনি! সে যেন চলন্ত পাহাড়!

কিন্তু জার্ম্মান ষাঁড়ের বিরাট আকৃতির চেয়ে আর একটা জিনিষ বেশী করে দর্শকদের চোখে পড়লো। ওর শিংয়ের সঙ্গে ঝোলানো ওটা কি? মালার মত ঘাড়ের দুপাশে ছড়িয়ে আছে? আর জানোয়ারটার দৌড়ের তালে-তালে দোল খাচ্ছে! সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে সেই দিকে। তারপর সকলে চীৎকার করে উঠলো হিংস্র আনন্দে। এতদিনে একটা খেলার মত খেলা দেখতে পাওয়া গেল বটে! ষাঁড়ের ঘাড়ে বাঁধা একটি বালিকা। নতুন রকম খেলা, সন্দেহ নেই। উল্লাসে তারা চীৎকার করে উঠলো!

দর্শকদের আনন্দ-কলরবের মধ্যে মিশে মিলিয়ে গেল একটি মানুষের অব্যক্ত আর্ত্তনাদ। সে মানুষ মার্কাস।

দর্শকদের সে-চীৎকার চিরে মনুষ্য-কণ্ঠে উঠলো তীব্র আর্ত্তনাদ—সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট মূর্ত্তির মানুষ যেন আকাশ থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়লো রঙ্গভূমির মধ্যে—ষাঁড়ের সামনে! ষাঁড়টা শিং নামিয়ে তেড়ে গেল তার দিকে—শিঙে বিঁধে তাকে তুলে নেবে! দর্শকের দল নির্ব্বাক···রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে আছে।

যা দেখলো, তা দেখবার প্রত্যাশা কেউ করেনি! লোকটা ঝুঁকে নুয়ে দুহাতে চেপে ধরলো ষাঁড়ের দুটো শিং—যেন মন্ত্রপড়ার মত ষাঁড় অমনি নিশ্চল, নিস্পন্দ! নড়বার সামর্থ্য নেই তার!

এ-লোক আর্শাস।

রোমের সৃষ্টি হওয়া থেকে এমন দৃশ্য কেউ দেখে নি!

ষাঁড় আর নড়ে না! আর্শাসও নড়ে না! দুই মহাশক্তির সংঘাত চলেছে একান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে! এ শক্তির পরিচয় শুধু আর্শাসের বাহুর মাংসপেশীতে। ষাঁড়টার ঘাড়ের পেশীও তেমনি স্ফীত হয়ে উঠেছে—কিন্তু লিজিয়ার দেহের নীচে ঢাকা পড়েছে বলে সে স্ফীতি চোখে পড়ছে না কারো!

যুদ্ধ চলেছে নিস্তব্ধতার মধ্যে! দর্শকরা নিস্তব্ধ। এমন যুদ্ধ কেউ কখনো দেখে নি! সকলে যেন নিশ্বাস নিতে ভুলে গেছে! কথা কইলে এ দৃশ্য এখনি বুঝি বিলুপ্ত হয়ে যাবে মায়া-মন্ত্রে! চুপ্! সকলে চুপ্! যা দেখছে তা সত্য? না—কোনো মহাশিল্পীর আঁকা ছবি? ঐ অতিকায় ষাঁড়ের শিং ধরে তার গতিরোধ···এ কি কোন মানুষে পারে? হারকিউলিস, থিসিউস প্রভৃতি বীরের যুগ অনেক দিন হলো শেষ হয়ে গিয়েছে!

নিস্তব্ধতা বুঝি ধীরে ধীরে উবে যাচ্ছে! একটা নীচু গলার গোঙানি, আর একটা দ্রুত তালের নিশ্বাস! গোঙানি জানোয়ারের, নিশ্বাস মানুষের! ষাঁড় গোঙাচ্ছে, তার ঘাড় নুয়ে ক্রমে ঘুরে যাচ্ছে একপাশে, তিলে-তিলে, ধীরে-ধীরে! ঘুরছে নিজের ইচ্ছায় নয়, আর্শাসের বাহুর পেষণে!

আর দর্শকরা? তাদের মুখে কথা নেই···হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছে সশব্দে, ঠিক ঐ আর্শাসের দ্রুত নিশ্বাসের তালে তালে!

মট্ করে একখানা হাড় ভেঙ্গে গেল। ষাঁড়ের ঘাড়ের হাড়! ফেনার সঙ্গে রক্ত বেরুলো ষাঁড়ের মুখ থেকে। সে টলে পড়লো,

কাত হলো—আর্শাস তার শিংয়ের উপর থেকে হতচেতন লিজিয়াকে তুলে নিলে নিজের কাঁধে!

গ্যালারির উপর তখন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে যেন! দর্শকরা এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে! উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে সকলে,—সাবাস! সাবাস! উৎসাহের আতিশয্যে অনেকে লাফিয়ে পড়লো রঙ্গভূমির মাঝখানে! আর্শাসকে ঘিরে বাহবা দিতে লাগলো। লিজিয়াকে দেখে সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগলো। আহা, ফুটন্ত লিলির মত মেয়েটি! একে বাঁচানো চাই···বাঁচানো চাই! সকলে সমস্বরে উপরপানে তাকিয়ে বলে উঠলো—নীরো! সীজার! ক্ষমা! ক্ষমা! ক্ষমা! প্রাণভিক্ষা!

কিন্তু নীরোর দয়া নেই! এই খৃষ্টানদের নির্ম্মূল করবেন তিনি! পম্পিয়াও বন্দিনী রূপসীকে বাঁচতে দেবেন না। নীরো নীচের দিকে বুড়ো আঙ্গুল ঘুরিয়ে ধরলেন! তার অর্থ,—মৃত্যু!

কিন্তু সে আদেশ পালন করে কে? দর্শকরা সম্রাটের ইঙ্গিত সত্ত্বেও লিজিয়াকে আর আর্শাসকে ঘিরে রেখেছে!

এমন সময়ে এক ঘটনা ঘটলো—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত! বিপুল জনতার এতক্ষণে নজর পড়লো মার্কাসের উপর! মার্কাস হঠাৎ তাঁর বন্ধন ছিন্ন করে রঙ্গভূমিতে নেমে সকলের সামনে এসে দাঁড়ালেন—দাঁড়িয়ে সেই বিপুল জনতাকে ব্যঙ্গ করে বললেন,—বীর রোমানগণ! তোমরা আর কতদিন এই রাক্ষস নীরোর শাসন মাথা পেতে সহ্য করবে? জানো, কে এই রোম দগ্ধ করেছিল? সে ঐ নীরো! নিজের পাপ ঢাকবার জন্যে সে নিরপরাধ খৃষ্টানদের উপর দোষ চাপি-

য়েছে! তোমরা নিজেদের চোখে দেখনি—রোমকে জ্বলতে দেখে ঐ নারকী প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে মনের আনন্দে বীণা বাজাচ্ছিল?

এ-দৃশ্য সত্যই সে-রাত্রে অনেক নাগরিক দেখেছিল। খৃষ্টান-মেধের রক্ত-দর্শনের নেশায় মশগুল হয়ে তারা ভুলে গিয়েছিল সে কথা। এখন রক্ত-দর্শন করে করে বিরাগ জন্মেছে তাদের। তাই তারা মার্কাসের অভিযোগ শুনে নতুন করে নীরোর দিকে চেয়ে দেখলো···শত সহস্র ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ দৃষ্টি। তাইজেলিনাসের অজস্র ইঙ্গিতেও প্রিটোরিয়ানরা জনতাকে আঘাত করলো না। নীরো দাঁড়িয়ে রইলেন। দর্শকের দল গর্জ্জন তুললো—নরকে যাক নীরো! ঘর-পোড়ানো নীরোকে হত্যা করো! সিংহাসন থেকে টেনে নামাও ঐ মাতৃহন্তাকে!

সব চেয়ে আশ্চর্য্য, প্রিটোরিয়ান গার্ডের দল তাইজেলিনাসের ইঙ্গিত-সত্ত্বেও নিশ্চল। নীরোর কঠোর আদেশেও তারা নাগরিকদের দলনে অগ্রসর হলো না। হয়তো সুযোগ পেয়ে গাল্‌বার উপর তাদের এখন মনের টান! গাল্‌বা রোমে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই তারা নীরোকে শেষ করে দেবে!

নাগরিকদের বিদ্রোহের উত্তাপ বেড়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে! তাদের সে ভাব আর প্রিটোরিয়ানদের উদাসীনতা দেখে গ্যালারির পিছনের দরজা দিয়ে নীরো প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। কিন্তু নাগরিকরাও প্রাসাদে প্রবেশ করলো সিংহদ্বার ভেঙ্গে। তাদের হাতে তাইজেলিনাস নিহত হলেন।

নীরো দেখলেন, পম্পিয়া সিংহাসন-কক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন। সম্রাজ্ঞী

বোধহয় সম্রাটকে তিরস্কার করতে আসছিলেন তাঁর ভীরুতার জন্য। কিন্তু নীরো তাঁকে সে অবসর দিলেন না। গলা টিপে নিজের হাতে পম্পিয়াকে তিনি হত্যা করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এলেন সেই উপেক্ষিতা আক্তি। একখানি ছোরা নীরোর হাতে দিয়ে আক্তি বললেন—এ ছোরা নিজের বুকে বসিয়ে এখনি নিজেকে শেষ করে দাও সম্রাট! নাহলে ওরা যেরকম ক্ষেপেছে—তোমাকে বন্দী করে কারাগারে রাখবে, নাহয় ঐ জার্মানির ষাঁড়ের সামনে ফেলে তোমাকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবে!···সে বড় ভীষণ! তার চেয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো নিজের হাতে!

নীরো ছোরা নিলেন কিন্তু নিজের বুকে নিজের হাতে ছোরা বসিয়ে দিতে পারলেন না। তখন আক্তি এসে তাঁর হাতের উপর নিজের হাত রেখে ছোরায় চাপ দিলেন। ছোরা নীরোর বুকে বসে গেল। কক্ষতলে লুটিয়ে পড়তে পড়তেও নীরো সখেদে বললেন—আমার মৃত্যুতে জগৎ তার শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে হারালো।

সে-ছোরা নীরোর বুক থেকে তুলে নিয়ে আক্তি নিজের বুকে বসিয়ে দিলেন। নীরোকে তিনি সারা জীবন ভালোবেসেছেন! মৃত্যুতে হলো তার অবসান।

··· ··· ···

পরের দিন গাল্‌বা সসৈন্যে রোমে প্রবেশ করলেন। বিপুল জনতা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করলো অসীম আনন্দে। প্রিটোরিয়ান গার্ডের সৈন্যরা তাঁকে বরণ করে তুললো রোমের সিংহাসনে।

মার্কাস সিসিলিতে যাত্রা করলেন—লিজিয়া, আর্শাস আর নাজারিয়াসকে নিয়ে। রোম থেকে বেরিয়ে তাঁরা সেইখানে এলেন—যেখানে নাজারিয়াসের সামনে পিটার জ্যোতির্ম্ময় যীশুর চরণে প্রণত হয়ে প্রশ্ন করছিলেন—ক্যুয়ো ভাদিস্ ডোমিনি ?

নাজারিয়াস সকলকে দেখালো—মাটিতে পড়েছিল পিটারের দণ্ড—তা থেকে নবীন তরু মুঞ্জরিত হয়ে পত্রে-পুষ্পে পল্লবিত হয়েছে।

এখনো সেখানে এক পুরাতন গির্জার ভগ্নাবশেষ চোখে পড়বে! তার উপর খোদাই-করা লেখাটি চেষ্টা করলে এখনো পড়া যায়। সে লেখা—ক্যুয়ো ভাদিস্ ডোমিনি···তুমি কোথায় চলেছো, প্রভু ?



